কবি ও নর্তকী

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির

প্রথম উজ্জ্বল প্রকাশ ঃ
শুভ রথযাত্রা, ১৩৬১

পরিবেশক ঃ
উজ্জ্বল বুক স্টোরস্
৬-এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

প্রতিষ্ঠাতা ঃ
শরৎচন্দ্র পাল
কিরীটিকুমার পাল

প্রকাশিকা ঃ
সুপ্রিয়া পাল
উজ্জ্বল-সাহিত্য-মন্দির
সি-৩, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭ (দ্বিতলে)

মুদ্রাকর ঃ
ভোলানাথ পাল
স্তনুশ্রী প্রিণ্টার্স
৪/১ই, বিডন রো
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ ঃ
কমল ব্যানার্জী

কবি ও নর্তকী

আমাদের প্রকাশিত
এই লেখকের
আরো কয়েকটি বই

এক জীবনে
সুখ অসুখ
তুমি কে?
কালো রাস্তা সাদা বাড়ি

গাড়িতে শঙ্কর আর অরিন্দম। দু'জনেরই বয়েস চব্বিশ। অরিন্দম ছিপছিপে লম্বা, শঙ্করের ব্যায়াম করা স্বাস্থ্য। গাড়িটা পুরনো, সর্বাঙ্গে শব্দ। চালাচ্ছে শঙ্কর।
অরিন্দম বলল, তুই লাল আলো অগ্রাহ্য করে চলে যেতে পারিস না?
স্টিয়ারিংয়ের ওপর অলসভাবে হাত রাখা শঙ্কর বলল, কেন, এত তাড়া কিসের?
—তাড়ার জন্য নয়। তুই পারিস কি না বল?
—কেন, যাব কেন? কতক্ষণই বা লাগবে!
— দূর ছাই সময়ের কথা হচ্ছে না। তোর গাড়িটা তো সবচেয়ে সামনে, হুস করে বেরিয়ে যেতে পারিস না? ধারে-কাছে তো পুলিস-টুলিসও নেই।
পুলিস না থাকলেই ট্রাফিক রুল ভাঙতে হবে?
—পুলিস যদি থাকেও, কি আর হবে, বড় জোর কয়েকটা টাকা ফাইন করবে।
—তুই আজ এত ছটফট করছিস কেন বল তো?
—ধ্যাৎ। চুপচাপ এরকম বসে থাকতে ভাল লাগে না। আজ পর পর ক'টা রেড সিগন্যাল পড়ল বল তো? আমি যদি গাড়ি চালাতে জানতাম, সোজা বেরিয়ে যেতাম, এক জায়গাতেও থামতাম না। তাতে যা হয় হোক?
—ভাগ্যিস তুই গাড়ি চালাতে জানিস না।
—শোন, আজ অনেক জায়গায় ঘুরব। অনেকক্ষণ। ডায়মণ্ড হারবার যাবি?
শঙ্কর এবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল অরিন্দমের দিকে। হাসল, খানিকটা প্রশ্রয়ের হাসি। বলল, গাড়িতে বেশী তেল নেই। তাছাড়া এই বৃষ্টি-বাদলার মধ্যে কোথায় ঘুরব রে। রিস্ক। চল, কোথাও বসে একটু চা-টা খাই।
—না।
— তা হলে চল নিখিলের কাছে যাই। আড্ডা মারা যাবে।

—দূর ! আজ আমার খুব বেড়াতে ইচ্ছে করছে। তোকে বললাম না সকালেই !

—কেন, আজ এরকম চাঞ্চল্য কেন ?

—আজ আমার জন্মদিন !

জুলাই মাসের সাত তারিখ। উনিশশো বাহাত্তর সাল। শুক্রবার। সকালের দিকে খুব একচোট বৃষ্টি হয়ে গেছে। আবার যে-কোন সময় হবে, কেননা আকাশে যথেষ্ট মেঘ। বিশেষত পশ্চিম গগন একেবারে নিবিড় কালো, পূব দিকে হালকা সাদা মেঘ, সেখান থেকে এসেছে সাময়িক আলো। অনেক রাস্তায় জল জমে আছে, তারই মধ্যে বাসে-ট্রামে অফিসযাত্রীর ভিড়, শতকরা পঞ্চাশজন লোক বৃষ্টি না হলে আকাশের দিকে কখনো তাকায় না। বৃষ্টির পর মানুষের অবস্থা কাহিল, বেড়াল ও কাকের কাছাকাছি, কিন্তু গাছপালার দিকে তাকাতে ভাল লাগে। সবুজ রং এইসময় চোখ জুড়ায়। ময়দান এলাকায় সৃষ্টির দৃশ্য এখন সমুজ্জ্বল। মহারাণীর স্মৃতিভবনটি স্নানসিক্ত, ধপধপে সাদা। কৃষ্ণপরীটি মনে হয় এক্ষুনি উড়ে যাবে।

বৃষ্টির ঠিক আগে, মেঘলা আকাশের নিচে পৃথিবীতে যে-রকম আলো ছড়িয়ে থাকে, সেই আলোর ঠিক বর্ণনা কোন ভাষায় নেই।

অরিন্দমের আজ জন্মদিন। যুবা বয়সে কোন পুরুষমানুষ সাধারণত জন্মদিন নিয়ে বাড়াবাড়ি করে না, কিন্তু অরিন্দম ছেলে-মানুষের মতন নিজের জন্মদিনটা ভালবাসে। নির্লজ্জের মতন সবার কাছে ঘোষণা করে। অবশ্য জন্মদিনে অরিন্দমের কপালে কেউ চন্দনের ফোঁটা পরাবে না, পায়েস রেঁধে খাওয়াবে না। অরিন্দম শুধু আজ অফিস থেকে ছুটি নিয়েছে। এবং সকালবেলা তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু শঙ্করকে গিয়ে বলেছে, চল, আজ কোথাও বেরিয়ে পড়ি।

—তোর আজ জন্মদিন ! সে কথা আগে বলিসনি কেন ?

—বাঃ, তোর বাড়িতে গিয়েই তো বললাম।

—তাহলে সেলিব্রেট করা যাক। কি করা যায় এখন ?

—ঘুরে বেড়ানো। অনেকক্ষণ ধরে।

—জন্মদিনের কথাটা তোর বেশ মনে থাকে তো।

—মনে থাকবে না কেন ? অনেকে সাদামাটা ভাবে বেঁচে থাকে। আমি যে এই পৃথিবীতে জন্মেছি, সেজন্য আমি গর্বিত।

—আমার তো নিজের জন্মদিনের কথা মনেই থাকে না।

—পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ জন্মাচ্ছে, সবার জীবনের তো আর বিশেষত্ব থাকে না। কিছু কিছু মানুষের জন্মদিনের কথাই লোকে মনে রাখে।

এলগিন রোডের কাছে বাঁক ঘুরিয়ে শঙ্কর বন্ধুর দিকে তাকাল। একে নিয়ে আর পারা যায় না—এই ধরনের একটু হাসি হেসে বলল, বুঝেছি মিস্টার হামবাগ! সিগারেট আছে? দে একটা।

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করল অরিন্দম। কিন্তু তার কাছে দেশলাই নেই। শঙ্করের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেশলাই খুঁজতে খুঁজতে বলল, সত্যি কথা বললে অমনি হামবাগ হয়ে যায়, না? আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পর তোকে কে মনে রাখবে রে? কিন্তু তখন আমার জন্মদিনে সারা দেশে উৎসব হবে।

আমি আরও পঞ্চাশ বছর বাঁচব। দেখে যাব, তোর জন্মদিনে উৎসব-টুৎসব হয় কি না। শুধু পদ্য লিখে কিস্যু হবে না রে। গান লেখ্, নৃত্যনাট্য লেখ্। দেখছিস না, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল দু'জনেই গান লিখেছিলেন বলেই—। বিদ্যাসাগর কিংবা জীবনানন্দের জন্মদিনে ক'টা উৎসব হয়?

—ধ্যাৎ! ওসব গান-ফান লেখার যুগ চলে গেছে!

—তাহলে নিখিলের বাড়িতেই যাই?

—কেন, ডায়মণ্ড হারবার যাবি না? চল্ না, বৃষ্টির দিনে দারুণ লাগবে।

—এই ঝরঝরে গাড়ি নিয়ে ডায়মণ্ড হারবার! মাথা খারাপ! তাছাড়া দুপুরবেলা বাবা বেরুবেন। গাড়িটা ফেরত দিতে হবে।

—ভেবেছিলুম ঘুরে বেড়াব। চল ট্রেনে চেপে যাই।

—এই বৃষ্টি-বাদলার মধ্যে জমবে না। তার চেয়ে এক কাজ করি। গঙ্গার ধারে গিয়ে বসা যাক্। এই সময়টা নিরিবিলি, কফি খাব—নিখিলটাকেও তুলে নিই। ডায়মণ্ড হারবারেও গঙ্গা, এখানেও সেই গঙ্গা—তফাতটা কি!

—হরিদ্বার লছমনঝোলাতেও সেই গঙ্গা। তবু তো মানুষ অতদূরে যায়!

ক্যাচ করে ব্রেক কষল শঙ্কর। একটা অল্পবয়েসী ছেলে একেবারে সামনে

এসে পড়েছিল। রাস্তার লোক একেবারে হাঁ হাঁ করে উঠেছে। কিন্তু লাগেনি ছেলেটির। উঠে দাঁড়িয়েছে ভ্যাবাচাকা মুখে। অরিন্দম তার দিকে তাকিয়ে কর্কশ গলায় বলল, কি, মরার শখ হয়েছিল? অ্যাঁ? ভিড় কাটিয়ে শঙ্কর আবার আস্তে আস্তে গাড়ি চালাচ্ছে। একটু দূরে এসে বলল, ওরকম ভাবে বলিস না। ও মরলে আমাদেরও প্রাণে বাঁচতে হতো না।

—বলব না! ইডিয়টের মতন দৌড়ে এসে গাড়ির সামনে পড়ে, রাস্তাঘাট দিয়ে হাঁটতেও শেখেনি বেশীর ভাগ লোক।

—ও কথা আর কোনদিন চেঁচিয়ে বলিস না। প্যাঁদানি খাবি। রাস্তাঘাটের অবস্থা দেখছিস না—লোক গিস্‌গিস্ করছে! লোকের হাঁটারই জায়গা নেই—তার মধ্যে আবার এত গাড়ি। লোকে যে আজকাল কথায় কথায় গাড়িওয়ালা মানুষদের ওপর এত রেগে যায়, সেটাকে ঠিক অন্যায়ও বলা যায় না।

—আমি ওসব বুঝি না। আমার আজ অনবরত ঘুরতে ইচ্ছে করছে, একটুও থামতে চাই না—তার মধ্যে এসব ঝামেলা।

—অরিন্দম, তোর আজকাল বড্ড অহঙ্কার হয়েছে।

অরিন্দম, হা হা করে হেসে উঠল। বলল, কবিদের একটু অহঙ্কার না থাকলে মানায় না। আমার স্বভাবটা কি রকম জানিস, আমি যখন রাস্তা দিয়ে পায়ে হেঁটে যাই, তখন সমস্ত গাড়িওয়ালা লোকদের ওপর আমার রাগ হয়। আমার মনে হয়, মোটরগাড়ির উচিত সবসময় পায়ে-হাঁটা মানুষদের সমীহ করে চলা। কোন গাড়ি যদি আমার গা ঘেঁষে যায়, কিংবা জোরে হর্‌ন্ বাজায় কিংবা কাদা ছেটকায়, তাহলে এত রেগে যাই যে—। আবার যখন কারুর গাড়িতে বা ট্যাক্সিতে চেপে ঘুরি, তখন রাস্তার লোকদের বেসামাল হাঁটা-চলা দেখলে ঠিক সেই রকমই রাগ হয়—

—মতের ঠিক নেই বলেই তো তোর লেখাগুলো এইরকম হয়ে যাচ্ছে!

—কি রকম?

—গরম দুধে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিলে যে-রকম হয়।

—শঙ্কর, সত্যি করে বল তো, আমার লেখা তোর কি রকম লাগে?

—সো সো।

—সো সো? তুই যে পরশুদিন বললি—

—সেটা মন্দ হয়নি। তবে ফ্রাংকলি বলছি, আমার ধারণা, কবিতা-টবিতার দিন শেষ হয়ে গেছে। কবিতা লেখার ব্যাপারটাই অবসোলিট হয়ে যাবে। মানুষ আর কবিতা-ফবিতা পড়ে সময় নষ্ট করতে চাইবে না!
বন্ধুর কথা শেষ করতে না দিয়ে অরিন্দম সগর্বে ঘোষণা করল, মোটেই না। পৃথিবীতে মানুষ যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন কবিতাও থাকবে। কিংবা তারও পরে। সব মানুষ মরে গেলেও কবিতা বেঁচে থাকবে। বেদ সমুদ্রে ডুবে গিয়েছিল, তবু তার উদ্ধার হয়েছে, জানিস না?
—কিন্তু ক'জন বেদ পড়ে? সবাই শুধু নাম শুনেছে—বেদ নামে একটা মহা মূল্যবান বই আছে—কিন্তু পড়ে দেখে কেউ? তেমনি দেখবি আর কিছুদিন বাদে সবাই জানবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খুব বড় কবি, কিন্তু কেউ পড়বে না!
—তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে? যতদিন মানুষ অন্ধ না হবে, ততদিন রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়বে। আমার কবিতাও পড়বে।
—মাথা খারাপ আমার না, তোর!
—তুই ঠিক করে গাড়ি চালা তো!
—ঠিকই চালাচ্ছি! কবিতা লিখে সময় নষ্ট, এনার্জি নষ্ট! নিজের পয়সায় বই ছাপতে হয়, কেউ কেনে না। আমি সব জানি!
—বাজে বকিস না!
—তুই কবিতা লিখিস কেন?
—আমি আনন্দ পাই। কবিতা লিখে আমরা এমন এক অদ্ভুত ধরনের আনন্দ পাই, যার স্বাদ তোরা জীবনে পাবি না।
আবার সেই অহঙ্কার। অন্যরা কিসে আনন্দ পায়, তুই তার খবর রাখিস?
একজন ডাক্তার একজন মানুষের প্রাণ বাঁচিয়ে যে আনন্দ পায়, একজন বৈজ্ঞানিক কোন আবিষ্কার করে—যা সারা পৃথিবীর কাজে লাগবে—কিংবা খুব সাধারণ কথাই ধর-না, একজন জেলে সারাদিন নদীতে জাল ফেলে ফেলে কিছুই পায়নি, তারপর যখন হঠাৎ সে একটা বড় মাছ পেয়ে যায় তখন তার যে আনন্দ···

॥ ২ ॥

নিখিল বাড়ি নেই। ওর বোন রীণা বলল, বসুন না!

শংকর বলল, নাঃ আমরা আর তাহলে বসব না। নিখিল এইসময় কোথায় বেরিয়েছে?

—দাদা এখুনি ফিরবে। একটু বসুন।

—চা-টা খাওয়াবে? তাহলে বসতে পারি।

—টা হবে না। শুধু চা খাওয়াতে পারি।

—তোমাদের বাড়িতে এলে রোজই তো শুকনো চা। আজ একটু কিছু খাওয়াও। রসগোল্লা-ফসগোল্লা আনো। আজ আমাদের অরিন্দমের জন্মদিন।

রীণা হেসে ফেলে তাকাল অরিন্দমের দিকে। জিজ্ঞেস করল, সত্যি আজ আপনার জন্মদিন?

শংকরও মুচকি হাসল। নকল ধমকের সুরে রীণাকে বলল, এতে হাসির কি আছে?

—ছেলেদের আবার জন্মদিন হয় নাকি?

—তোমাদের বছরে দু'তিন বার জন্মদিন হতে পারে, আর ছেলেদের একবারও হবে না?

অরিন্দম চুপ করে আছে। এমনিতে সে যতই বারফট্টাই করুক, মেয়েদের সামনে লাজুক হয়ে যায়। মিনমিন করে বলল, আমি তো কিছু বলিনি। শংকর এসব বানাচ্ছে।

—এই, তুই একটু আগে বললি না, আজ তোর জন্মদিন?

—মোটেই না। আমার জন্মদিন হচ্ছে ১লা বৈশাখ।

—কি গুল-তাপ্পিই ঝাড়তে পারিস বাবা!

দরজা দিয়ে ঢুকে একপাশে খাবার টেবিল, অন্যদিকে বসবার ঘর। বসবার ঘরে রীণার দিদি ঝুমাকেই পড়াচ্ছেন একজন বুড়ো মাস্টারমশাই। মাস্টারমশাই যথেষ্ট বুড়ো হলেও বসবার ঘরের পর্দা ফেলা হয়নি।

ওরা বসল খাবার টেবিলে। ঝুমার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়। অস্থির ভাবে শরীর মোচড়া-মুচড়ি করে ঝুমা। মাস্টারমশাই সেটা বুঝতে পেরে বললেন, আজ তাহলে এই পর্যন্ত থাক?

ঝুমা তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ে। মাস্টারমশাইকে সসম্ভ্রমে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসে। তারপর দরজা বন্ধ করেই চঞ্চলা গতিতে ওদের কাছে

এসে বলল, ভাগ্যিস আপনারা এলেন। একদম পড়তে ভাল লাগছিল না আজ। এত বৃষ্টি, তার মধ্যেও মাস্টারমশায়ের আসা চাই।
রীণা বলল, এই দিদি, তোর না একমাস বাদে পরীক্ষা?
—তুই চুপ কর তো! পরীক্ষা কতদিন পেছোবে তার ঠিক আছে?
পরীক্ষার আগে মেয়েদের চেহারা যে-রকম হয়, ঝুমারও শাড়ী অগোছালো, চুল বাঁধেনি, ব্লাউজের তলা থেকে ব্রা-র স্ট্র্যাপ বেরিয়ে পড়েছে। ঝুমা অরিন্দমের দিকে ফিরে বলল, এই অরিন্দমদা, মিথ্যে কথা বলেছিলেন কেন? সত্যি তো আপনার আজ জন্মদিন।
অরিন্দম চুপ। শংকর জিজ্ঞেস করল, তুমি কি করে জানলে?
— আমি জানি।
—অরিন্দম তবুও চুপ। রীণা বলল, তাহলে আমরা খাওয়াব কেন? অরিন্দমদার জন্মদিন, উনিই তো খাওয়াবেন আমাদের।
অরিন্দম সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করে বলল, 'আচ্ছা, খাইয়ে দিচ্ছি। এই শংকর, পাঁচটা টাকা দে তো।
—বাঃ, তুই খাওয়াবি, আমি টাকা দেবো কেন!
—ধার। ধার দে না।
—নিয়ে ফেরত না দেওয়াকে কেউ ধার বলে? এর আগে কতবার এরকম নিয়েছিস মনে আছে?
অরিন্দম রীণার দিকে ফিরে বলল, খেতে চেয়ে কী বিপদে ফেললে, দেখলে তো! কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে যাচ্ছে। এখন পুরনো ধারের কথা তুলবে!
ঝুমা বলল, বুঝেছি, বুঝেছি। উঠুন।
—উঠব? কোথায় যাব?
—মাকে প্রণাম করে আসুন। জন্মদিনে গুরুজনদের প্রণাম করতে হয়।
অরিন্দম উঠে পড়ল। ঝুমার মা বাতে ভুগছেন, শয্যাশায়ী। শিয়রের জানলা খুলে গল্পের বই পড়ছিলেন চোখের খুব কাছে নিয়ে। অরিন্দম কাছে গিয়ে ডাকল, মাসীমা!
বই সরিয়ে ঝুমার মা বললেন, কে? সন্তোষ? এই ঝুমা, চশমাটা কোথায় রাখলাম, দ্যাখ তো?
ঝুমা চশমা খুঁজে দিয়ে বলল, সন্তোষদা নয় মা, অরিন্দমদা।
উনি চশমা পরার আগেই অরিন্দম প্রণাম করে ফেলেছে। ঝুমার মা

বললেন, অরিন্দম ? অনেকদিন দেখিনি তোমাকে—
—মাসীমা, আমি গত মাস থেকে একটা চাকরি পেয়েছি। এর মধ্যে আসতে পারিনি, তাই আপনাকে প্রণাম করা হয়নি।
চাকরি পেয়েছ ? বাঃ, বেশ, ভাল। রাখতে পারবে তো ?
কেন রাখতে পারব না ?
যা দিনকাল—
—সে কথা ঠিক। কিন্তু, তুমি এই নিয়ে ক'টা ছাড়লে ?
—পাঁচটা। এবার আর ছাড়লে চলবে না।
—ভাল। ঝুমা, তোর দাদাকে ডাকতে পাঠিয়েছিস ?
—দাদা একটু বেরিয়েছে। এক্ষুনি ফিরবে।
দরজার কাছে এসে ঝুমা অরিন্দমের পিঠে একটা চিমটি কেটে জিজ্ঞেস করল, আপনি আবার চাকরি ছাড়লেন কবে, পেলেনই বা কবে ? মিথ্যুক !
—কি করব ! তোমার মা যে আমাকে সন্তোষ বলে ভেবেছেন !
বাড়ির একতলাতেই নিখিল একটা শিশি-বোতল তৈরীর কারখানা বসিয়েছে। সারাদিন ঝকর-ঝং শব্দ সারা বাড়িতে। তাই শুনে মনে হয়, নিখিলের মোটামুটি ভালই চলছে। নিখিল একটু বাদেই এল। গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞেস করল, কি রে, আজ সকালেই যে ? অফিস-টফিস নেই ?
অরিন্দম ততোধিক গম্ভীর হয়ে বলল, চীফ মিনিস্টার মারা গেছেন, তাই আমাদের অফিস ছুটি।
নিখিল শশব্যস্ত হয়ে বলল,—আমাদের চীফ মিনিস্টার মারা গেছেন ? কখন ?
—তুই রেডিও শুনিস না ? কাগজও পড়িস না।
—কাগজ পড়েছি। কাগজে তো এ খবর নেই ? সিদ্ধার্থ রায় মারা গেছেন ? কি সাঙ্ঘাতিক কথা ! আর তোরা এখানে বসে গল্প করছিস ?
—ধ্যৎ ! সিদ্ধার্থ রায়ের কথা কে বললে ! রাজস্থানের এক্স মিনিস্টার মারা গেছেন।
নিখিল বিরক্ত হয়ে বলল, সে তো পরশুদিন ! আজ তার জন্য আবার কি ?
—পরশু আমার এমনিই ছুটি ছিল। আজ সেই জন্য আমি ছুটি নিলাম।
নিখিল বিরক্ত ভাবে তাকাল অরিন্দমের দিকে। বলল, এই রকম ভাবে কথা বললে তুই একদিন মার খাবি আমার কাছে !

শঙ্কর বলল, কি রে নিখিল, তুই খুব নিরাশ হলি মনে হচ্ছে ?
নিখিল আবার গম্ভীর। বলল, সকালবেলা কাজ নষ্ট করতে এসেছিস যে ? কেটে পড় এখন।
—কাটব কি! ঝুমা আমাদের জন্য চা বানাচ্ছে। ঝুমা, হয়েছে ?
খাবার টেবিলে পটে চা ভিজিয়ে ঝুমা বলল, এক্ষুনি ছেঁকে দিচ্ছি।
অরিন্দম অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, আমি চা খাবই না। আমার জন্য কফি।
– সে কথা আগে বলতে পারেননি ? চা তৈরি হয়ে গেল !
—আমাকে তো আগে জিজ্ঞেস করা হয়নি। কফি পেলে খাব, না হলে কিছুই খাব না।
নিখিল বলল, বাবা রে বাবা! তোরা জ্বালাতেও পারিস! নে, তোরা বসে বসে চা কফি খা। আমি ফ্যাক্টরিতে যাচ্ছি। আমার কাজ আছে।
শঙ্কর বলল, বোস বোস! বেশি কাজ দেখাসনি। তাও তো শুধু খালি খালি শিশি-বোতল বানাস। ভর্তি বোতল হলেও কথা ছিল।
অরিন্দম বলল, তাছাড়া, নিখিল আমাদের সঙ্গে বেরুবে।
—বেরুব ? কোথায় ?
– দীপঙ্করের সাঙ্ঘাতিক অসুখ। বাঁচবে কি না ঠিক নেই। তাকে দেখতে যাব—শঙ্করের গাড়ি আছে।
নিখিল অবজ্ঞার হাসি হেসে বলল, দ্যাখ অরিন্দম, সব সময় তোর ঐ সব চালাকি খাটে না। দীপঙ্করের অসুখ! দীপঙ্করের সঙ্গে এই ঘণ্টা-খানেক আগেই আমার দেখা হয়েছে ধর্মতলার মোড়ে। অফিস যাচ্ছিল—
—দীপঙ্কর রায়ের কথা বলিনি। তুই তাকে দেখেছিস তো ? আমি দীপঙ্কর সেনগুপ্তর কথা বলছি—আমাদের সঙ্গে কলেজে পড়ত—
—সেই দীপঙ্কর সেনগুপ্ত এখন বিলেতে। সেখানে যদি তার অসুখ করে থাকে, আমার পক্ষে তো গিয়ে দেখা সম্ভব নয় ভাই।
একটুও বিচলিত না হয়ে অরিন্দম বলল, কী মুশকিল, অসুখ না করলে কি কারুর সঙ্গে দেখা করা যায় না ? সুস্থ লোকেদের সঙ্গে দেখা করা কি নিষেধ ?
—কিন্তু, তুই আমার সঙ্গে চালাকি করছিলি কেন ? তাহলে শোন, দীপঙ্কর রায়ের সঙ্গেও আমার আজ দেখা হয়নি, আর দীপঙ্কর সেনগুপ্ত এখন বিলেতে থাকে কি না—তাও আমি জানি না।

শঙ্কর হাততালি দিয়ে বলল, ব্রাভো! নিখিলটাও দেখতে দেখতে চালাক হয়ে গেল। পৃথিবীর আর কে বোকা রইল তাহলে?
শঙ্করের কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে নিখিল অরিন্দমকে বলল, তোকে আর একটা কথাও বলা হয়নি। কাল কারখানায় বসে তোর কবিতার বইটা পড়লাম। সবটা। তিন জায়গায় ছন্দ ভুল আছে।
—ইমপ্রসিবল্‌।
শঙ্কর জিজ্ঞেস করল, নিখিল, তুই কি কারখানায় বসে কবিতার বই পড়িস নাকি? তাহলে কী রকম কাজ হয় বুঝতেই পারছি।
—খুব ভালই কাজ হয়। মাঝে মাঝে মনটাকে একটু অন্যদিকে ফেরালে কাজ ভাল হয়। সব সময় কাজের কথা ভাবলে জ্যাম হয়ে যায় মাথার মধ্যে। অরিন্দম, তোর তিন জায়গায় ছন্দ ভুল আছে।
—হতেই পারে না। তুই ছন্দের কি বুঝিস?
—খুব ভাল বুঝি। আমি সায়েন্স পড়লেও এটা ভুলে যাস না, ম্যাট্রিকে আমি বাংলা আর সংস্কৃতে লেটার পেয়েছিলাম।
—তোদের সেই ছন্দজ্ঞান আর এখনকার ছন্দ এক নয়।
—ভুল হলেই ঐ কথা বলিস।
—কোথায় ভুল, দেখা তো? নিয়ে আয় বই!
—দেখাচ্ছি। ঝুমা, নিয়ে আয় তো বইটা—আমার শোবার ঘরের টেবিলে আছে।
শঙ্কর বলল, এই সেরেছে! কবিতা-টবিতার কথা উঠলে অরিন্দমকে তো আর থামানো যাবে না। কি রে, তুই যে বেড়াতে বেরুবি বলছিলি!
—চল না, আমি তো রেডি।
—নিখিল, এখন তর্ক রাখ। একটু বেরুবি? অরিন্দমের আজ গাড়িতে করে ঘুরে বেড়ানোর শখ হয়েছে।
নিখিল চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বলল, না রে, তোরা যা। আমার সত্যি কাজ আছে। একটা বড় অর্ডার আছে, দু'শিফটে কাজ চলছে। তাও তো আমি আজ সন্ধ্যের পর থাকতে পারব না।
—কি করছিস সন্ধ্যেবেলা?
—একটা পার্টিতে যেতে হবে। সিনেমার পার্টি।
—সিনেমার পার্টি? কোথায়?
—'স্বপ্নের জিজ্ঞাসা' বলে যে বইটা আগামী সপ্তাহে রিলিজ হবে, তার

জন্য পার্টি। প্রোডিউসার আমার ক্লায়েন্ট, তাছাড়া এমনিতেও খুব চেনা। বিশেষ করে যেতে বলেছে।
নিখিলের গলায় একটু গর্বের সুর ফুটেছিল, সেই সুযোগ নিয়ে অরিন্দম ঝপ্ করে বলে ফেলল, নিখিল, আমাকেও নিয়ে চল না ঐ পার্টিতে!
—তুই যাবি? কিন্তু আমার যে একার নেমন্তন্ন—
—তোর তো খুব চেনা বললি। এসব পার্টিতে এক-আধজন লোক এক্সট্রা গেলে কোন ক্ষতি হয় না।
—তুই ওখানে গিয়ে কি করবি? কারুকে চিনিস না।
—দেখব। সিনেমার লোকদের কখনো সামনাসামনি দেখিনি—খুব দেখতে ইচ্ছে করে আমার।
শঙ্কর ধমক দিয়ে বলল, এই অরিন্দম, তুই কি বাচ্চা ছেলে নাকি? তুই তো সিনেমা দেখিস না। চিনিস না অনেককে, তাদের সামনাসামনি দেখে কি করবি?
—তবু দেখব। আমার খুব ইচ্ছে করে—
রীণা বলল, দাদা আমিও যাব। সৌমিত্র চ্যাটার্জি আসবে? উত্তমকুমার? বিশ্বজিৎ? দাদা, আমাকে নিয়ে চল—
নিখিল এক ধমক দিয়ে বলল, না, তোমাদের ওসব জায়গায় যেতে হবে না।
শঙ্কর বলল, ওকে বকছিস কেন? অরিন্দমের বদলে রীণাকেই বরং নিয়ে যা—ওরই ভাল লাগবে। বাংলা সিনেমা তো মেয়েদের জন্যেই চলে!
নিখিল বলল, না মেয়েদের নিয়ে যেতে পারব না। চেষ্টাচরিত্র করে তবু অরিন্দমকে নিয়ে যেতে পারি—
অরিন্দম অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে বলল, তাহলে ঠিক যাচ্ছি তো। আমি? আমাকে তুই বাড়ি থেকে তুলে নিবি? আমি বাড়িতেই থাকব। দারুণ ব্যাপার হবে—বিরাট বড় পার্টি তো, আমি মনে মনে ভাবব, আজ আমার জন্মদিন উপলক্ষেই পার্টি হচ্ছে।
সবাই হো-হো করে হেসে উঠল। শঙ্কর বলল, হামবাগ নাম্বার ওয়ান! নিখিল বলল, তোকে কেউ চিনতেই পারবে না। তোর খুব একা একা লাগবে।
—সে আমি ঠিক ম্যানেজ করে নেব। পার্টিটা কোথায় হচ্ছে রে?
—নিউ আলিপুরে, প্রোডিউসারের বাড়িতে।

—ইস্, গ্র্যাণ্ড হোটেলে হলে আরও ভাল হতো। এই তালে একবার গ্র্যাণ্ড হোটেলে ঢুকে নেওয়া যেত। হ্যাঁ রে নিখিল, ওখানে কি স্যুট পরে যেতে হবে? আমার যে টাই নেই। ভাল কোটও নেই।
—স্যুটের দরকার নেই। ধুতি-পাঞ্জাবি পরে গেলেই যথেষ্ট। আমি তো তা-ই পরে যাব।
—চমৎকার, তা হলে তো ঝামেলাই রইল না।
—কিন্তু তুই সত্যিই যাবি? তুই কবি লোক, এসব তোর ভালো লাগবে?
—কবিদের সব কিছু ভালো লাগে!
—চল তা হলে। সাতটার একটু আগে চলে আসিস।
—বাঃ! তাহলে ঐ কথাই রইল। এখন তাহলে তুই কাজ করতে চলে যা, তোকে আর ডিসটার্ব করব না। ঠিক সাতটায় তো?
সিঁড়ি দিয়ে ওরা নামছে। ঝুমাও আসছে সঙ্গে। অরিন্দম একেবারে পেছনে, ঝুমা ওর জামা টেনে দাঁড় করাল। ভুরু ও চোখ দিয়ে এমন একটা ইশারা করল, যার মানে হয়, আপনি আজ ঐ পার্টিতে যাবেন না। অরিন্দম ভুরু তুলে সেই ভাবেই জিজ্ঞেস করল, কেন? ঝুমা বলল, আপনাকে মানায় না। আপনার একটা মানসম্মান নেই?
শঙ্করের গাড়িতে ওঠার পর অরিন্দম মিনতি-চোখে তাকাল ঝুমার দিকে। ঝুমা চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। রীণার মুখে একটা বিরক্তির ভাব, তার ধারণা, অরিন্দমদার জন্য তার আজ সিনেমা স্টারদের দেখা হল না।

গাড়ি একটু দূরে যাওয়ার পর শঙ্কর বলল, তুই কী রে? হ্যাংলার মতন অমনি ঐসব আজেবাজে পার্টিতে যাবার বায়না ধরলি?
—আজেবাজে মানে? কত সব নাম-করা লোক আসবে!
—আসুক! আরও অনেক মাতাল—ফাটকাবাজও আসবে। তাছাড়া তোকে কি নেমন্তন্ন করেছে? বিনা নেমন্তন্নে যেতে তোর লজ্জা করবে না?
—লজ্জার কি আছে? কেউ কি এ-রকম যায় না? রবাহূত অতিথি বলে একটা কথাই তো আছে। ইংরিজিতে আছে গেটক্রাশার। কেউ

যদি না-ই যাবে, তাহলে এই কথাগুলো তৈরি হল কেন ?
—যায় অনেকে, কিন্তু লোকে তাদের পছন্দ করে না !
— আমাকে ঠিকই পছন্দ করবে।
—কবিতা লিখিস বলে তোর একটা অহংকার নেই ? এই যে তখন বলছিলি—
—প্রচুর অহংকার আছে। কবিতা লিখতে গেলে সব রকম মানুষকে দেখতে হয়। তুই আর বাগড়া দিসনি। যাকগে, শোন, তোর তো একটা সিল্কের পাঞ্জাবি আর সোনার বোতাম আছে একসেট—তুই কখনো পরিস না—আজ আমাকে দিবি ?
—কি করবি ? তুই কি বেনে সেজে পার্টিতে যেতে চাস নাকি ?
—আমার আজ ঐ সব পরার খুব ইচ্ছে হচ্ছে। হিপিদের যে কারণে নোংরা জামাকাপড় পড়তে ইচ্ছে হয়।
— তার মানে ?
—আমার নেই বলে। আমি কখনো সিল্কের জামা কিংবা সোনার বোতাম পরিনি।

॥ ৩ ॥

নিখিল বলল, কি রে ? একেবারে নবকার্তিক সেজেছিস যে আজ !
—পাঞ্জাবিটা ঠিক ফিট করেছে তো ? এটা শংকরের—
—কাঁধের কাছে ঢল-ঢল করছে। শংকর তোর থেকে অনেক মোটা—
—এমন কিছু বোঝা যাচ্ছে না। কি বল ?
—তুই কিন্তু বেশী আজেবাজে কথা বলিস না লোকের সঙ্গে। দেখিস, আমার প্রেস্টিজ যেন ঢিলে না হয়।
—মাথা খারাপ ! আমি একদম চুপচাপ থাকব। শুধু দেখে যাব, আর মনে মনে নোট করব—
—দেখি, যদি সৌমিত্র চ্যাটার্জি আসে, আলাপ করিয়ে দেবো তোর সঙ্গে। সৌমিত্র হয়তো তোর কবিতা পড়লেও পড়তে পারে। ও সাহিত্য-টাহিত্য নিয়ে অনেক পড়াশুনো করে। আর কথা বলার বিশেষ কাউকে পাবি না—

—কেন, আমি কি সাহিত্য ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে কথা বলতে পারি না ?
—বেশী কথা না বলাই ভাল। বেশী কথা বললেই বেফাঁস কথা বেরিয়ে যায়।
—নিখিল, তুই এমন ভয় দেখাচ্ছিস যে, আমি এখন থেকেই নার্ভাস হয়ে যাচ্ছি।
—নার্ভাস হবার কিছু নেই। শুধু একটু চুপচাপ থাকবি। বোবার শত্রু নেই। আর একটা কথা, ওখানে হুইস্কি-টুইস্কির ছড়াছড়ি যাবে—তুই যেন খাসনি আবার। তুই নিম্বুপানি চাইবি—
—কেন, একটু চেখে দেখব না ?
—সামলাতে পারবি না। শেষকালে নেশা-ফেশা হয়ে গেলে—
—খুব পারব। আমি একবার খেয়েছিলাম। একটু ঝাঁজ ঝাঁজ লাগে—কিন্তু ভয় পাবার মত এমন কিছু না—
—যদি খেতেই হয়, অনেকখানি সোডা মিশিয়ে একটু একটু করে সিপ করে খাবি। ঢক ঢক করে খেয়ে ফেলিস না—
—ট্যাক্সি এসে থামল একটি বড় বাড়ির সামনের রাস্তায়। প্রচুর গাড়ি, ভেতরে ঢোকাই যায় না—ট্যাক্সিওয়ালা ভেতরে যেতে চাইছে না, নিখিল তাকে নিয়ে যাবেই। ওরা যে বাসে করে আসেনি, ট্যাক্সি করে এসেছে—এ সম্পর্কে কারুর মনে কোন সন্দেহের অবকাশ রাখতে চায় না।
গেটের সামনে একগাদা লোকের ভিড়। একজন পৌঢ় নিখিলকে দেখে হাতজোড় করে বললেন, আসুন, আসুন! তারপর তিনি অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে আরও বিগলিত ভাবে পুনশ্চ বললেন, আসুন, আসুন! মনে হয় যেন অরিন্দমের সঙ্গে তার বহুদিনের চেনা। অর্থাৎ তাতেই বোঝা যায়, তিনি নিখিলকেও চিনতে পারেননি।
প্রশস্ত দালান দিয়ে ওরা চলে এল সিঁড়ির কাছে। সিঁড়িতে কার্পেট পাতা। খানিকটা উঠেই সামনের দেওয়ালে একটা বড় আয়না। সেদিকে চোখ পড়তেই অরিন্দম নিজের চুল ঠিক করে নিল। সিল্কের পাঞ্জাবি ও ধপধপে ধুতিতে তাকে মানিয়েছে মন্দ না। এখানকার ক্রাউড-এর সঙ্গে বেমানান হয়। শুধু সে তার ধুতির কোঁচা সামলাতে বেশী ব্যস্ত এবং মুখে সামান্য ঘাম। এত করেও শেষ পর্যন্ত রুমাল আনতে ভুলে গেছে, এজন্য আফসোসের অবধি নেই।
দোতলায় রঙীন টালি-বসানো চওড়া বারান্দা। পাশাপাশি দুটি বড়

ঘর—সব জায়গাতেই বেশ ভিড়। বসবার জায়গাগুলি প্রায় ভর্তি হয়ে গেছে, অধিকাংশ লোকই দাঁড়িয়ে। পুরুষদের মধ্যে ছড়ানো-ছেটানো ভাবে দশ-বারোজন মহিলাও উপস্থিত, তাদের পোশাকে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। অধিকাংশ মহিলারই পেট ও নাভি পরিদৃশ্যমান। মেয়েদের কারুর গায়ে সুতোটি নেই, অর্থাৎ সবই সিল্ক।
চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিখিল ফিসফিস করে বলল, এখনো নামকরা বিশেষ কেউ আসেনি। ওরা সাধারণত দেরীতেই আসে। পার্টি কত রাত পর্যন্ত চলবে, তার তো ঠিক নেই! আমরা কিন্তু সাড়ে দশটার সময় চলে যাব।
অরিন্দম বলল, আমি শেষ পর্যন্ত না দেখে যাব না।
নিখিল চোখ দিয়ে তাকে ধমকাল।
উর্দি-পরা বেয়ারা ট্রেতে অনেকগুলো গেলাস সাজিয়ে নিয়ে ঘুরছে। কাছাকাছি আসতেই নিখিল হাত বাড়িয়ে একটা গেলাস তুলে নিল। দেখাদেখি অরিন্দম একটা গেলাস নিতে যেতেই নিখিল তাকে একটা ঠেলা দিল কনুই দিয়ে। বেয়ারাকে বলল, এই সাহেবের জন্য যাস্তি সোডা দিয়ে একঠো হুইস্কি লে আও।
বেয়ারা চলে যেতেই অরিন্দম একটু ক্ষুণ্ণ ভাবে বলল, তুই সব সময় আমাকে এ-রকম গার্ড দিয়ে চলিস না। আমি কি ছেলেমানুষ নাকি?
—হুইস্কিটা বড্ড কড়া। বিলিতি। তুই সহ্য করতে পারবি না।
—তুই পারলে আমি পারব না?
—আমার অভ্যেস আছে। তা ছাড়া মুখ দিয়ে মদের গন্ধ বেরুলে তোর বাড়ীতে বকবে না?
—পান খেয়ে যাব।
—পান খেলে আরও বিশ্রী গন্ধ বেরোয়!
—তা হলে তোর বা শঙ্করের বাড়িতে থেকে যাব আজ?
—তা থাকতে পারিস। কিন্তু এসব বেশী খাসনি, আমি বার বার বলে দিচ্ছি কিন্তু!
পার্টিতে সাধারণত যা হয়, সবাই ঘুরে ঘুরে গল্প করছে। ওরা দু'জন দাঁড়িয়ে আছে বারান্দার রেলিং ঘেঁষে। চতুর্দিকে প্রচুর ফুলের সমারোহ। এখানে-ওখানে নানা আকারের কয়েকটি তামার অ্যাশট্রে, সেগুলোতে ছাই ফেলতে সহজে ইচ্ছে করে না। এ রকম দামী ভাবে সাজানো কোন

বাড়িতে অরিন্দম এর আগে আসেনি। নার্ভাসনেস কাটাবার জন্য অরিন্দম সিগারেট ধরাল এবং কাঠিটা বেপরোয়া ভাবে ছুঁড়ে ফেলল বাইরে।
একজন পৌঢ় অভিনেতাকে ঘিরে আছে একটা বড় দল। তিনি অনবরত রসিকতা করছেন, সবাই ফেটে পড়ছে হাসিতে। সব কথা হাসির হোক বা না হোক। নিখিলের কান সেই দিকে খাড়া!
এই সময় বেয়ারা আবার এল ট্রে নিয়ে। নিখিলের চোখ এড়িয়ে অরিন্দম ফিকে গেলাসের বদলে তুলে নিল একটা গাঢ় রঙের গেলাস। তুলেই বড় গোছের একটা চুমুক। তারপর সিগারেটে ঘন ঘন টান।
নিচে একটা কলরব। কয়েকজন দুপদাপ করে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। কয়েকজন উঠে এল। সবাই সচকিত তারপরই অনেক মানুষ পরিবৃতা হয়ে এলেন একজন মহিলা। বহু আভরণে সজ্জিতা, ঠোঁটে অল্প হাসি। তার প্রতিটি গহনাই নতুন ধরনের ও দেখবার মতন।
নিখিল চুপি চুপি বলল, মিসেস সেন। মিসেস সেন এসে গেছেন।
—মিসেস সেন কে রে?
নিখিল রীতিমতন বিরক্ত হয়ে বলল, তুই এঁকেও চিনিস না? হাঁদারাম! এই তো সুচিত্রা সেন!
—ও হ্যাঁ। তাই মুখটা খুব চেনা চেনা লাগছিল।
—আর ঐ রবি ঘোষকে চিনতে পেরেছিস তো? জহর রায়···দেখবি এক্ষুনি জমে যাবে—
নিখিল এখানে আসবার আগে বেশ নিস্পৃহ ভাব দেখাচ্ছিল। যেন এখানে আসার ওর তেমন ইচ্ছে ছিল না, নেহাত ভদ্রতার খাতিরে এসেছে। এখন কিন্তু বিখ্যাত লোকদের দেখে সে ভেতরে ভেতরে বেশ উত্তেজিত। যে প্রযোজকের সঙ্গে নিখিলের চেনা, তিনি মাত্র আধ সেকেণ্ডের জন্য নিখিলের দিকে চেয়ে হেসেছেন। অর্থাৎ নিখিল না এলে কেউ ভ্রূক্ষেপও করত না। নিখিল যেন কার সঙ্গে কথা বলতে বলতে ভিড়ের দিকে এগিয়ে গেল।
অরিন্দম বারান্দার রেলিংয়ে হেলান দিয়ে একা একা সিগারেট টানছে। এবং কিছু করার নেই বলে হাতের গেলাসে চুমুক দিচ্ছে মাঝে মাঝে।
একটু বাদেই সেটা ফুরিয়ে যেতে সে কাছাকাছি একটা বেয়ারাকে ডেকে বলতেই সে আর একটা ভর্তি গেলাস নিয়ে এল। অরিন্দম সেটাতেও

চুমুক দিতে লাগল ঘন ঘন। ভালোই লাগছে তার—নিজেকে বেশ সাবালক মনে হচ্ছে। বিদেশের কবি-সাহিত্যিকরা কত মদ খায়—আজ সে তাদের সমকক্ষ।

তাকে এখানে কেউ চেনে না, সে এখানে একলা দাঁড়িয়ে আছে—এই ব্যাপারটায় আহত হয়েছে তার ছেলেমানুষী অহংকার। এখানে অনেক বিখ্যাত লোক উপস্থিত—কিন্তু সে অরিন্দম লাহিড়ী, সে-ই বা কম কিসে? সে-ও কি হাতের মুঠোয় আমলকীর মতন এই পৃথিবীটাকে ধরে রাখেনি? সেও কি এক একটা কবিতা লিখে বাংলা সাহিত্যে বিপ্লব ঘটিয়ে দিচ্ছে না?

হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিক ভাবে তার একটা কথা মনে পড়ল। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, আমি এদের সবাইকে আগে থেকেই মেরে রেখেছি। হে অর্জুন, তুমি নিমিত্ত মাত্র। এইখানে যত লোক উপস্থিত, তাদেরও সবার মৃত্যু নির্দিষ্ট হয়ে আছে, অথচ কেউ জানে না। ম্যাজিশিয়ানের মতন সে যদি হঠাৎ হাত উঁচু করে চেঁচিয়ে বলতে পারত, থামো! সবাই থেমে যেত একসঙ্গে, পুতুলের মতন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকত—আর সে, অরিন্দম লাহিড়ী, একটা নোটবই খুলে একে একে সবার মৃত্যু-তারিখ বলে দিত—তা হলে কী রকম অবস্থা হতো এখানে? এই সব স্যুট টাই পড়া হুমদো হুমদো লোক, এই সব নাভি বার করা মেয়ে, এদের মুখের চেহারা কি রকম হতো তা হলে?

—আপনার কাছে দেশলাই আছে?

একজন দারুণ লম্বা ও রোগামতন লোক অরিন্দমের পাশে এসে আগুন চাইছে। আজকাল-পুরুষমানুষদের সাধারণত গোঁফ থাকে না, এই লোকটির রোগা চেহারায় বেশ পুরুষ্টু গোঁফ। চোখ দুটো লালচে।

অরিন্দম দেশলাই বার করল। লোকটি সিগারেট জেলে বেমালুম নিজের পকেটে ভরে ফেলল দেশলাইটা। তারপর ঈষৎ জড়িত গলায় জিজ্ঞেস করল—আপনার সঙ্গে কি আমার আলাপ আছে?

অরিন্দম কোন উত্তর না দিয়ে হাসি হাসি মুখ করে তাকিয়ে রইল।

লোকটি বলল, আপনার সঙ্গে আমার আলাপ আছে কি না বলুন না, আমার মেমরি একেবারে টেরিবল্! আপনাকে আমি সারা জন্মে কখনো দেখেচি বলে মনে হয় না—তবু বলা যায় না, আপনার সঙ্গে হয়তো আমার দু'তিনবার আলাপ হয়েছে। কি হয়েছে?

—আমারও মনে নেই।

—অল রাইট! অন্য ভাবে জিনিসটা দেখা যাক। আপনি কি আমাকে চেনেন?

—না।

—ভেরী ন্যাচারাল। আমি বিখ্যাত লোক নই। আমার চেহারা কখনো স্ক্রিনে দেখা যায় না। আমি হচ্ছি অ্যাসিস্ট্যাণ্ট প্রোডাকশন ম্যানেজার। আমরা বাঘের দুধ যোগাড় করি, সাপ খেলার দৃশ্যে সাপুড়ে ধরে আনি —নাইনটিন ইলেভেনের মোটরগাড়ি যদি যোগাড় করতে হয়···আপনি কি বিখ্যাত লোক?

উত্তর না দিয়ে অরিন্দম কাঁধ ঝাঁকালো কায়দা করে।

—আপনার নাম কি? একটু বাদেই ভুলে যাব অবশ্য, তবু শুনে রাখি—এটা ভদ্রতা, বুঝলেন না!

- আমার নাম অরিন্দম মল্লিক।

—অরিন্দম মল্লিক? আপনি কি গোপেন মল্লিকের কেউ হন?

অরিন্দম কখনো গোপেন মল্লিকের নাম শোনেনি। ঘাড় নাড়ল।

—চেনেন না? কোথায় থাকেন দাদা আপনি?

—চোরবাগান চেনেন? তার এপাশে সিংহীবাগান—

—চোরবাগান? সে আবার কোথায়? লাইফে এরকম জায়গার নাম শুনিনি। তার ওপর আবার সিংহীবাগান! ওফ্।

অরিন্দম মুখ-চোখ কঠিন করে বলল, আপনি অনেক কিছুই শোনেননি তাহলে। নর্থ ক্যালকাটার যে-কোন লোককে আমাদের বাড়ির নাম জিজ্ঞেস করলে দেখিয়ে দেবে। শুধু বলবেন, রাজেন মল্লিকের মার্বেল প্যালেসটা কোথায়!

লোকটি তার পুরুষ্টু গোঁফ ও ভুরু দুটি আন্দোলিত করে বলল, মার্বেল প্যালেসে থাকেন? আপনি তো তাহলে মালদার লোক। আপনার সঙ্গে আলাপ রাখায় লাভ আছে, অনেক সময় শুটিংয়ের সময় দরকার হয়—ঐ তো তপনদা এসে গেছেন।

লোকটি দ্রুত চলে যাচ্ছিল। অরিন্দম হাত দিয়ে তাকে আটকে বলল, এক সেকেণ্ড! আপনার কাছে দেশলাই আছে?

-হ্যাঁ, আছে। নিন না!

অরিন্দম সিগারেট ধরিয়ে দেশলাইটা রেখে দিল নিজের পকেটে। লোকটি

কোন আপত্তি করল না—হন হন করে এগিয়ে গেল।
নিখিলকে আর দেখাই যাচ্ছে না। চোখ দিয়ে খুঁজল অরিন্দম। হয়তো ঘরের মধ্যে ঢুকে গেছে। কিন্তু সে একা ওখানে যাবে না। বেয়ারার কাছ থেকে খালি গেলাস বদলে নিল। মনটা এখন বেশ চাঙ্গা লাগছে। কিন্তু মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি। এ-সব পার্টিতে বেশ কয়েকজন চেনাশুনো না থাকলে ভাল লাগে না। সবাই কথা বলছে, শুধু সে চুপচাপ একলা দাঁড়িয়ে—এর কোন মানে হয়?
—কী রঞ্জিতবাবু, কী খবর?
এবার একজন স্থূলকায় লোক, মাথায় টাক, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। অরিন্দম অভিজাত ভঙ্গিতে মুখের চেহারা গম্ভীর করে বললে, আপনার ভুল হয়েছে, আমার নাম রঞ্জিত নয়।
ওঃ হো! আমারই ভুল হয়েছে। আই অ্যাম স্যরি। পাশ থেকে অনেকটা—
লোকটি চলে যাচ্ছিল, কিন্তু অরিন্দমের ইচ্ছে কথা বলার। আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ে বলল, রঞ্জিত বোধহয় আসেনি এখনো। আমিও খুঁজছি—
লোকটি বলল, রঞ্জিত বম্বে গেছে, ফেরার কথা নয় এর মধ্যে। আপনাকে দেখে ভুল করে ভাবলুম, বুঝি আগেই ফিরে এসেছে।
অরিন্দম বলল, আমি যতদূর জানি, রঞ্জিত আরও সপ্তাহ দুয়েক থাকবে বম্বেতে।
এই রকম ভাসা ভাসা দু'চারটে কথা বলার পর অরিন্দম জিজ্ঞেস করল, আপনার নামটা কিন্তু জানা হল না—
লোকটি নিজের নাম বলে অরিন্দমের নাম জানতে চাইল। একটুও দ্বিধা না করে অরিন্দম বলল, আমার নাম অরিন্দম মুখার্জি। আমার দাদাকে আপনি নিশ্চয় চেনেন।
—কে আপনার দাদা?
—হেমন্ত মুখার্জি।
—হেমন্তদা? আপনি হেমন্তদার ভাই? আপন ভাই?
—ঠিক আপন নয়, মানে, মাসতুতো ভাই—
—হেমন্তদার সঙ্গে তো আমার লাস্ট উইক-এই দেখা হল বম্বেতে—
—আমিও তো তখন বম্বেতে ছিলাম। ওঁর বাড়িতেই।
—তা হবে। ঠিক লক্ষ্য করিনি। হেমন্তদার কাছে আমাকে আবার

যেতে হবে, শিগগিরই—

—এবার গিয়ে আমার খোঁজ করবেন।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। মিউজিক টেকিং-এর সময় আপনিও যদি থাকেন—
নিখিল ঘুরতে ঘুরতে আসছে এদিকে। অরিন্দমের আর উৎসাহ রইল না লোকটির সঙ্গে কথা বলার। লোকটিকে এড়িয়ে এগিয়ে গেল নিখিলের দিকে।

নিখিল বলল, কিরে, আলাপ-সালাপ হল কারুর সঙ্গে? না একলা একলা দাঁড়িয়ে আছিস? দেখা হল সব কিছু?

—কী দেখব?

—বাঃ, যে-জন্য এই পার্টিতে এলি!

—কেন, এসেছি কেন?

—বা রে বা, তুই নিজেই আসবার জন্য এত ঝুলোঝুলি করলি।

—আমি কেন আসতে চেয়েছিলুম, তা তো আমি জানি না!

—এই, তোর কথা ওরকম হয়ে যাচ্ছে কেন? বেশী খাসনি তো?

—না না, সেই একটা গেলাস।

—এবার খাবার সাজাচ্ছে টেবিলে। খাবারটা খেয়েই কেটে পড়ব।

· শেষ না হওয়া পর্যন্ত থাকব।

—আর কী দেখবি? যারা আসবার প্রায় সবাই তো এসে গেছে। উত্তমবাবু আসতে পারবেন না শুনলাম। ঐ যে অপর্ণা সেনকে চিনতে পারছিস তো? কি দারুণ স্মার্ট? ফিগারখানা যা না ঐ দ্যাখ পাহাড়ী সান্যাল, শুভেন্দু চ্যাটার্জি, মৌসুমী—চন্দ্রাবতীকে দেখেছিস! এত বয়েস হয়ে গেছে, এখনও কী রকম একটা

—সত্যজিৎ রায় আসেননি? আমাকে একটু দেখিয়ে দিস তো!

—সত্যজিৎ রায় এলে কারুকে দেখিয়ে দিতে হয় না। চিনিয়েও দিতে হয় না। একবার তাকালেই চেনা যায়। ছবিবাবুকে খুব মিস করেছি, আগে ছবি বিশ্বাস ছাড়া এসব পার্টি ভাবাই যেত না—অরিন্দমের দৃষ্টির ঠিক সোজাসুজি, ঘরের মধ্যে একটি নারী দাঁড়িয়ে আছে। গোলাপী রংয়ের শাড়ি পরা। তার ব্লাউজ, চটি ও টিপের রং-ও গোলাপী মনে হয়। আঙুলে আলতো করে ধরা একটা জলন্ত সিগারেট, হাতের কাচের গেলাসে স্বচ্ছ রংয়ের পানীয়।

সেইদিকে চেয়ে থেকে অরিন্দম বলল, ঐ মেয়েটি কে রে?

নিখিল পেছন ফিরে বলল, তুই ওকেও চিনিস না ? ও তো ডালিয়া।
—ডালিয়া কে ?
—চুপ, আস্তে ! চেঁচিয়ে বলিসনি, লোকে হাসবে !
—হাসির কি আছে ?
– ডালিয়াকে চেনে না এমন কেউ আছে ? তোর মতন বুদ্ধু ছাড়া !
—কে বল্ না ?
—পর পর পাঁচখানা ছবিতে নেমেছে। টপ ফেভারিট। বম্বেতেও অনেকগুলো ছবি করেছে।
—মেয়েটিকে দেখতে বেশ।
—বেশ কি বলছিস ? দারুণ ? আগুন যাকে বলে। শুনেছি, ও খুব অহঙ্কারী।
—সুন্দরী মেয়েদের তো অহঙ্কার থাকবেই। ওরা প্রিভিলেজড্ ক্লাস তো, ওরা তো আর সবার মতন নয় ! ওর সঙ্গে আমার একটু আলাপ করিয়ে দিবি ?
—আমার সঙ্গেই আলাপ নেই, আমি কি করে আলাপ করিয়ে দেবো ! কেন, আলাপ করে কী করবি ?
—একটু দেখব। হাসলে ওর দাঁতগুলো কী রকম দেখায়, চোখের পাতাগুলো কত বড়, আঙুলের ডগাগুলো কী ধরনের সুন্দর জিনিস দেখার একটা আনন্দ আছে তো।
—দু'টাকা কুড়ির টিকিট কিনে ওর যে-কোন বই দেখে আয়, আরও অনেক কিছু দেখতে পাবি। অনেক বেশী কিছু, বুঝলি—
নিখিল চোখ টিপল। অরিন্দম বুঝতে পারলে না। জিজ্ঞেস করল, অনেক বেশী মানে ?
—বুঝলি না ? সিনেমায় কতবার আঁচল খসে যাবে, কতরকম পোজ দেবে আর হিন্দী সিনেমায় বৃষ্টিভেজার সীন তো থাকবেই।
—ধ্যাৎ ! ওসব না। সামনাসামনি দেখতে চাই। এমনি গিয়ে আলাপ করা যায় না ?
– পার্টিতে এসে অবশ্য আলাপ করা দোষের কিছু নয়। কিন্তু তোকে পাত্তা দেবে কেন ?
—একটুক্ষণ কথা বললে কি ক্ষয়ে যাবে নাকি ? চল না যাই !
—আমি বাবা ওতে নেই। যেতে হয় তুমি একলা যাও। ওদের সব সময়

চ্যালারা ঘিরে থাকে। তাছাড়া শুনেছি, অনেক হীরোইনের সঙ্গে বডি-গার্ড থাকে।
—আমরা তো কোন ক্ষতি করছি না। একটু শুধু কথা বলব -
—তুই নিজে যা না—
—আমি একলা ? ওরে বাবা—
অরিন্দম আবার রেলিংয়ে ঝুঁকে দাঁড়াল। একলা একলা কোন মেয়ের সঙ্গে কথা বলার সাধ্য তার নেই। হঠাৎ তার মনে পড়ল ঝুমার কথা। ঝুমা তাকে এখানে আসতে বারণ করেছিল। ঝুমা নিজের দাদাকে বারণ করেনি, শুধু তাকে ।
নিখিল পকেটে হাত দিয়ে বলল, এই যা, সিগারেটের প্যাকেটটা ওখানে ফেলে এসেছি।
—আমার কাছে আছে, নে।
—দাঁড়া, আমার প্যাকেটটা নিয়ে আসি। এতক্ষণ থাকলে হয়।
নিখিল আনতে গেল, কিন্তু তক্ষুনি ফিরল না। অরিন্দম আবার একা। এতক্ষণ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, একেবারে সিঁড়ির কাছে, হয়তো বিসদৃশ দেখাচ্ছে এই ভেবে সে একটু সরে দাঁড়াল। এখন ঘরের ভেতরেই বেশী ভিড়, বারান্দায় দু'একটা বসার জায়গা খালি আছে, ইচ্ছে হলে বসতে পারে। বসল না। এক জায়গায় পাশাপাশি তিনজন অভিনেত্রী বসে খুব গল্প জমিয়েছে, সোফার পেছন থেকে মাথা ঝুঁকিয়ে আছে একজন তরুণ নায়ক, তার হাত একটি মেয়ের কাঁধে।
যেখানে দাঁড়িয়েছে অরিন্দম, সেখান থেকেও সোজাসুজি ডালিয়া নামের মেয়েটিকে দেখা যাচ্ছে। সে বিশেষ কারুর সঙ্গে কথা বলছে না—মোহ-মাখানো হাসি দিয়ে তাকাচ্ছে এক একবার এক একজনের দিকে। কথা বলছে অন্যরা। পার্টির মেজাজ এখন অনেক ঢিলেঢালা। কথাবার্তা ও হাসির শব্দ ক্রমশ উঁচু গ্রামে। কয়েকজন পুরুষ রীতিমত মাতাল।
অরিন্দমের ইচ্ছে হল, সে খুব জোরে হাততালি দিয়ে উঠবে। এক নিমেষে থেমে যাবে সব কথাবার্তা ও হাসি, নিঃশব্দে সবাই তাকাবে তার দিকে। সে তখন দীপ্তকণ্ঠে জানাবে—আমার নাম অরিন্দম লাহিড়ী, আমি একজন কবি। তোমরা এতক্ষণ আমাকে দেখতে পাওনি কেন ? আমাকে বাদ দিয়েই তোমরা গল্পে মেতে উঠলে, এত সাহস ?
মনে মনে কিছুক্ষণ দৃশ্যটা উপভোগ করলে অরিন্দম। তারপর আবার

ফাঁকা ফাঁকা। ঘরের ভেতরে টেবিলে খাবার সাজানো হয়েছে নানান পাত্রে। তাকে তো কেউ ডাকল না। নিখিলও এল না। নিখিল কি ভুলে গেছে তার কথা?

অরিন্দমের অসহ্য লাগছে। ট্রে-হাতে বেয়ারারাও বিশেষ গ্রাহ্য করছে না তাকে, কাছে আসছে না। অরিন্দম এগিয়ে গিয়ে বেয়ারার কাছ থেকে হুইস্কির গেলাস না পেয়ে একটা রামের গেলাসই তুলে নিল, খেয়ে ফেলল ঢক ঢক করে। এটার স্বাদ অন্য রকম। গলা একটু জ্বালা করল বটে, কিন্তু ভালই লাগছে। এসব জিনিসের নিশ্চয়ই খুব বেশী দাম। এরা এক একটা পার্টিতে কত টাকা খরচ করে কে জানে!

এবার অরিন্দম সোজা এগিয়ে গেল ঘরের দিকে। ডালিয়া নাম্নী মেয়েটির পাশে গিয়ে দাঁড়াল। চোখ বুলিয়ে দেখল তার সারা শরীরটা। মেয়েটি সত্যিই সুন্দর, অলৌকিক ধরনের সুন্দর। এমন নির্লোম, মসৃণ, গোলাপী আভাময় কোন মানুষের গায়ের চামড়া হয়?

অনেকেই প্লেট ও কাঁটা-চামচ নিয়ে টেবিল থেকে খাবার তুলে নিচ্ছে। ডালিয়ার হাতেও একটা প্লেট। অরিন্দম গিয়ে তার পাশে দাঁড়াতেই ডালিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে হাতের প্লেটখানা অরিন্দমের হাতে দিয়ে নিজে আর একখানা তুলে নিল।

প্রথমেই এরকম আশাতীত সৌভাগ্যে খুব খুশী হয়ে উঠল অরিন্দম। অন্যরা খাবার তুলছে, কিন্তু তার সেদিকে খেয়াল নেই, খালি প্লেট হাতে নিয়েই যেতে লাগল ডালিয়ার পাশাপাশি। অদ্ভুত মাদক ধরনের সেন্টের গন্ধ আসছে ডালিয়ার শরীর থেকে।

অরিন্দম আস্তে আস্তে বলল, আপনার সঙ্গে আমার—

ডালিয়া মুখ তুলে মিষ্টি করে হাসল। অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার প্লেট খালি কেন? নিন! না হলে আমার রাস্তাটা ছেড়ে দিন।

লজ্জা পেয়ে অরিন্দম বলল, ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই যে—।

একটু সরে গিয়ে অরিন্দম আলটপকা দু'তিন রকম খাবার তুলে নিল তার প্লেটে। খাওয়া সম্পর্কে তার কোন উৎসাহই নেই। বরং তাড়াহুড়ো

করে খাবার তুলতে গিয়ে তার হাত থেকে একটা চামচ পড়ে গেল। ঝন ঝন করে শব্দ হল সবাইকে সচকিত করে। সবাই এক মুহূর্ত কথা থামিয়েই আবার শুরু করল কথা। অরিন্দম নিচু হয়ে মেঝে থেকে চামচটা তুলতে যেতেই পাশ থেকে একজন লোক বলল, থাক, থাক, তুলতে হবে না। আর একটা নিন না—

অরিন্দম আবার চলে এসেছে ডালিয়ার পাশে। মুখ নিচু করে বলল, আপনার সঙ্গে আমি একটু আলাপ করতে চাই, আমার নাম—।

ডালিয়া মুখ তুলে সোজা তাকাল অরিন্দমের দিকে। ঘন কালো রং দিয়ে তার চোখ আঁকা। ভিজে ভিজে কাজলের মতন। শুধু তাই নয়, অরিন্দম এই প্রথম লক্ষ্য করল, ডালিয়ার চোখের পাতায় নীল রং দেওয়া। ডালিয়া কি কোন শুটিং থেকে এখানে এসেছে, না এমনিতেই সাজগোজের সময় চোখে এরকম নীল রং দেয়, অরিন্দম বুঝতে পারল না। সব মিলিয়ে অলৌকিক দেখাচ্ছে মেয়েটিকে।

অরিন্দম আবার বলতে গেল, আমার নাম···। শেষ করতে পারল না। অরিন্দমের চোখের দিকে চোখ রেখেই ডালিয়া বলল, বিকু!

অরিন্দম বলতে গেল, আমার নাম তো বিকু নয়। তার আগেই ডালিয়া আবার সেই রকম তাকিয়ে থেকেই বলল, বিকু! আমার ড্রাইভারের খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে ?

অরিন্দম এবার ঘাড় ফেরাল। তার পেছনে দাঁড়ানো একজন লম্বা লোককে এই কথা বলা হয়েছে। লম্বা লোকটি বলল, হ্যাঁ, আমি বলে দিয়েছি।

ডালিয়া আবার খাবার তুলল, এক চামচ স্যালাড। অরিন্দম একটুও দমে না গিয়ে ফের বলল, আপনার সঙ্গে আমি একটু আলাপ করতে চাই, আমার নাম···

ডালিয়া আবার তাকাল অরিন্দমের দিকে। বলল, ন্যাপকিন কোথায় ? ন্যাপকিন ?

পাশ থেকে দু'জন লোক শশব্যস্তে বলল, এই যে ন্যাপকিন। এই যে—

ন্যাপকিন হাতে ডালিয়া খাবার টেবিল থেকে একটু দূরে সরে গেল। অরিন্দম তার পাশাপাশি এগিয়ে বলল, আপনার সঙ্গে আমি একটু—

ডালিয়া এবার একগাল হাসল। ভারী পরিতৃপ্তির হাসি। অরিন্দমের সারা গায়ের দিকে চোখ বুলিয়ে বলল, আপনার জামার বোতামগুলো

খোলা কেন ?
অন্যের জামা পরেছে অরিন্দম, ঠিক ফিট করেনি। বোতামগুলো খুলে যাচ্ছে। এক হাতে খাবারের প্লেট, আর এক হাত দিয়ে বোতামগুলো আটকাতে গিয়ে অরিন্দম বুঝতে পারল, মেয়েটির বেশ দুষ্টুবুদ্ধি আছে। তাকে লজ্জায় ফেলার জন্যই মেয়েটি এই অসুবিধাজনক অবস্থায় তার বোতাম খুলে যাবার কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। অরিন্দম আরও বুঝতে পারল, এক হাতে খাবারের প্লেট ধরে রেখে আর এক হাতে বোতাম সে লাগাতে পারছে না তার ব্যালান্স ঠিক থাকছে না, মাথা একটু টলে যাচ্ছে। এটা কেন হল ? মেয়েটিকে দেখে কি তার মাথা ঘুরে গেছে ? নাকি, হুইস্কি খাবার ফল ?
কোনরকমভাবে একটা বোতাম আটকে অরিন্দম আবার সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করল। সে টের পাচ্ছে, মেয়েটি তাকে কিছুতেই তার কথা শেষ করতে দিচ্ছে না। এবার সে প্রথমেই শুরু করল আমার নাম অরিন্দম লাহিড়ী, আপনি বোধহয় আমাকে চেনেন না—
একটুও দেরী না করে ডালিয়া বলল, না, চিনি না।
-- আমি এমনিই একটু আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।
—আপনি কে ?
—আমার নাম অরিন্দম লাহিড়ী।
—সে তো শুনলাম। তা ছাড়া—
—আমি একজন কবি।
ডালিয়া তার সুন্দর মুখখানায় বিস্ময় ফুটিয়ে বলল, কবি ? যেন এই শব্দটি সে জীবনে প্রথম শুনল। তারপর খুব মনোযোগ দিয়ে কাঁটা দিয়ে একটা কড়াইসুঁটি তুলে ঠোঁটে রাখল। এত অনায়াসে কাঁটা দিয়ে কড়াইসুঁটি তুলতে আর কারুকে দেখেনি অরিন্দম। ডালিয়া তার পাতলা টুসটুসে ঠোঁটে কড়াইসুঁটিটা রেখে ঠিক যেন আঙুর ফল খাচ্ছে এই ভঙ্গিতে মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। তারপর আবার বলল, কবি ? আমি কি আপনার কমপোজিশানে লিপ দিয়েছি ?
অরিন্দম একটু হকচকিয়ে গেল। চলচ্চিত্র-জগতের টেকনিক্যাল কথাবার্তার সঙ্গে সে পরিচিত নয়। লিপ দিয়েছি, মানে কি ?
অরিন্দম জিজ্ঞেস করল, কি বললেন ?
—আপনি কোন্ কোন্ ছবিতে গান লিখেছেন ?

এবার অরিন্দমের আত্মসম্মানে ঘা লাগল। ঈষৎ জোর গলায় বলল, আমি কোন সিনেমায় কখনো গান-টান লিখিনি। আমি একজন কবি। আমার দুটো কবিতার বই আছে। লেটেস্ট বইটার নাম 'হরিণীর ডাক-নাম'— আপনি পড়েননি নিশ্চয়ই!
ডালিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। অন্যমনস্ক হয়ে গেল চোখ দুটো। সুডৌল একটি হাত ঘুরিয়ে কবজির ঘড়ি দেখল। তারপর হাতের প্লেটটা নামিয়ে রাখল পাশের টেবিলে–কিছুই প্রায় খায়নি। ন্যাপকিন দিয়ে আলতোভাবে ঠোঁট মুছে বলল, আচ্ছা–।
ডালিয়া চলে যাবার জন্য শরীর আন্দোলিত করেছিল, অরিন্দম মিনতি করে বলল, শুনুন, একটু দাঁড়ান।
ডালিয়া ভুরু তুলল। মুখের রেখা একটু কঠিন। বলল, আমি কোন প্রোডিউসারকে কারুর জন্য রিকোয়েস্ট করি না।
– কিসের রিকোয়েস্ট?
—আপনাকে তো বললাম। আপনার গানের জন্য আমি কোন প্রোডিউসারকে বলতে পারব না।
—না না, আপনি ভুল করছেন। আমি কখনো সিনেমা-টিনেমার জন্য গান লিখি না। সে-রকম কোন ইচ্ছেই নেই আমার। আমি একজন কবি—
—তা হলে?
—'তা হলে' কথা দুটো ডালিয়া এত সুন্দরভাবে উচ্চারণ করে যে বার বার শুনতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ও কথার তো কোন মানে হয় না। এখানে অপ্রাসঙ্গিক।
—আমি এমনিই আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে চাই।
ডালিয়া একটু জোরে বলল, বিকু, দেখো তো ইনি কি নিয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করতে চান?
সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে দুটি হাত অরিন্দমের কাঁধ ছুঁলো। সেই লম্বা লোকটা সর্বক্ষণ তার পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিল। লোকটি ভদ্র অথচ দৃঢ় গলায় বলল, ভাই, একটু অন্যদিকে যান। ইনি এখন ব্যস্ত আছেন।
অপমানে কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল অরিন্দমের। তাকে জোর করে এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সে কি কোন অন্যায় করেছে? মাথাটা রীতিমত ঘুরতে লাগল অরিন্দমের। সে অসহায়ভাবে বলল, আপনি

আমাকে চলে যেতে বলছেন ?
—আপনার যদি কিছু বলার থাকে বলুন।
—আপনি আমাকে চলে যেতে বলছেন ?
অরিন্দমের গলায় শিশুর মতন অভিমান। সে শুধু ভাবছে, আমি তো অন্যায় করিনি কিছু। আমি তো ওকে অপমান করিনি, ও কেন করল ?
—আমি তো আপনাকে আর কিছু বলিনি, শুধু একটু আলাপ করতে চেয়েছি।
ডালিয়া আবার একটা ভুবনমোহিনী হাসি দিল। বলল, কী মুশকিল ! আপনি ভাই তখন থেকে শুধু বলছেন, আলাপ করতে চাই ! ঠিক আছে, আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি, আপনি আলাপ করুন !
পাশ থেকে দু'তিনজন জড়িত গলায় হেসে উঠল। রীতিমতন একটা ভিড় জমে গেল ওদের পাশে। কোথা থেকে নিখিল এই সময় হাজির হয়ে অরিন্দমের হাত ধরে বলল, এই অরিন্দম, কি করছিস কি ! চল—
কে একজন বলল, আপনার বন্ধু বেশী ড্রাঙ্ক হয়ে গেছে !
অরিন্দম চেঁচিয়ে উঠল, মোটেই আমি ড্রাঙ্ক নই। আমি এর চেয়ে অনেক বেশী ড্রিঙ্ক করতে পারি। আপনাদের সবার চেয়ে বেশী, বুঝলেন ?
কিন্তু কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে অরিন্দমের মাথা ঘুরে গেল, পা টলে গেল। আর একটু হলে সে পড়ে যাচ্ছিল, নিখিল সামলে নিল তাকে। নিখিল এক ধমক দিয়ে বলল, চল, বাড়ি চল !
শেষ দিকটাই উত্তেজনায় অরিন্দমের সব কিছু ওলোট-পালোট হয়ে গেছে। এখন তার সত্যিই জ্ঞান নেই। এক ঝটকায় নিখিলের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সে এক-পা এগিয়ে গেল ডালিয়ার দিকে। অভিমান-লুব্ধ গলায় বলল, আমি আপনাকে কোন অপমান করেছি ? সত্যি করে বলুন ? আমি শুধু আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে চেয়েছিলাম—
ডালিয়া ছুরির মত ঝকঝকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল, আলাপ করার এখনো বাকি আছে ?
—নিশ্চয়ই ! আপনার নামই তো এখনও জানি না। আমি আমার নাম বলেছি, আপনার নাম তো বলেননি আমাকে। ভদ্রতা জানেন না ? ডালিয়া কি ? ডালিয়ার সঙ্গে কোন পদবী নেই ? নাকি শুধু ফুল !
তারপর আর কিছু মনে নেই অরিন্দমের। কানে ভেসে উঠল অনেক হাসির আওয়াজ, তীক্ষ্ম মেয়েলী গলা, ঘরের আলোগুলো ঘুরতে লাগল

—অরিন্দম হাঁটু দুমড়ে ঝুপ করে বসে পড়ল মেঝেতে—। আর একটু হলে সে ডালিয়ার পায়ের ওপরেই পড়ে যাচ্ছিল. কিন্তু শেষ মুহূর্তে সেই লম্বা লোকটি, যার নাম বিকু, কাঁধ ধরে সোজা করে রাখল অরিন্দমকে।

॥ ৪ ॥

—শঙ্কর, মাইরি, আমি তোর কাছে খুবই লজ্জিত! তোর দামী সিল্কের জামাটা ছিঁড়ে গেল!
—যা, যা, জামা ছিঁড়েছে তো কি হয়েছে! ও জামা তো এমনিই আমি পরতাম না। বাক্সে তোলা থাকত
—না না, তোর মা কি মনে করবেন!
—আমার মা আমার জামা-কাপড়ের হিসেব রাখেন না।
—আমি তোকে কিনে দেবো একটা ঐ রকম জামা। পুজোর সময় অ্যাডভান্স পেলেই -
—ক' টাকা অ্যাডভান্স পাবি পুজোতে? জামাটার দাম জানিস? তোর সব টাকা ফতুর হয়ে যাবে।
—তা হোক, তবু আমি কিনে দেবো।
—থাক, আর বেশী বেশী করতে হবে না। টাকাটা আমাকে দিয়ে দিস না হয়, আমি অন্য কিছু কিনব।
—ভাগ্যিস, তোর সোনার বোতামগুলো হারায়নি! জামাটা যে কি করে ছিঁড়ল—
—কি করে ছিঁড়ল, তোর মনে নেই?
—বাঃ, মনে থাকবে না কেন? সেদিন সেই পার্টি থেকে ফেরার সময়, ট্যাক্সি পাইনি, নিখিল আর আমি হেঁটে হেঁটে আসছিলাম বড়রাস্তার দিকে। হঠাৎ একটা রিক্সা -পাশ দিয়ে যেতে যেতে -একটা লোহার শিক না কি যেন বেরিয়েছিল, খোঁচা মারল আমার জামায়—আমায় খানিকটা টেনে নিয়ে গেল, ছাড়াতে ছাড়াতেই জামাটা এতখানি—
—তুই শেষ পর্যন্ত রিক্সায় চাপা পড়লি? রিক্সায় চাপা পড়লে কি হয় জানিস তো? কলকাতা শহর থেকে বের করে দেওয়া হয়।
—চাপা পড়ব কেন? পাশ দিয়ে যাবার সময় খোঁচা মারল।

—পাশ দিয়ে খোঁচা মারলে বুকের কাছে জামা ছিঁড়ে যায় ?

—না, মানে—

—কি হয়েছিল, আমি বলছি, শোন। তুই সেদিন পার্টিতে আনাড়ীর মতন বেশী হুইস্কি খেয়ে আউট হয়ে গিয়েছিলি। তারপর গিয়েছিলি একজন অ্যাকট্রেসের সঙ্গে আদিখ্যেতা করতে। তাল সামলাতে পারিসনি। পড়ে গিয়েছিলি, কয়েকজন মিলে তোকে ধরাধরি করে তুলতে যায়—তুই উঠতে চাসনি সেই সময় টানামানিতে জামা ছিঁড়ে যায়। জামাটা অবশ্য পুরনো হয়ে গিয়েছিল—

—এসব একদম বাজে কথা। এসব কিচ্ছুই হয়নি।

—দ্যাখ অরিন্দম, আর মিথ্যে কথা বলার চেষ্টা করিস না। আমি নিখিলের কাছে সব শুনেছি। একবার যা না নিখিলের বাড়িতে—নিখিল তোর ওপর রেগে আগুন হয়ে আছে।

—নিখিল কক্ষনো আমার ওপর বেশীদিন রাগ করে থাকতে পারবে না।

—তুই নিখিলের প্রেস্টিজ পাংচার করে দিয়েছিস।

—নিখিল আমাকে ওর বন্ধু হিসেবে পরিচয় না দিলেই পারত। সবাই ভাবত আমি একটা স্ট্রেঞ্জার—

—তারপর যদি ধোলাই দিত !

—অত সোজা নয়।

—তুই সেদিন সত্যিই ধোলাই খেতিস ! তুই পার্টি নষ্ট করে দিয়েছিস ! ওসব পার্টিতে মাতলামি করার অধিকার আছে শুধু বিখ্যাত লোকদের আর খবরের কাগজের সাংবাদিকদের !

—আমিও বিখ্যাত লোক। আমার নাম অরিন্দম লাহিড়ী - এই সেঞ্চুরির সেকেন্ড হাফের বেস্ট পোয়েট !

—তোর নাম বললে ওখানে একটা লোকও চিনতে পারতো না।

—অনেকেই আমাকে চিনতে পেরেছে। দুটি মেয়ে আমার কাছ থেকে অটোগ্রাফ নিয়েছে।

—সত্যি ?

—এসব কথা কেউ মিথ্যে বলে ?

—যাগ গে যাক, ঐ অ্যাকট্রেসটার সঙ্গে তোর কি কথা হল ?

—তুই ডালিয়াকে দেখেছিস কোন ফিল্মে ? দারুণ জিনিস মাইরি ! সামনাসামনি না দেখলে বুঝতে পারবি না।

—তোর সঙ্গে কী কথা হল, বল না ?

—অনেক গল্প-টল্প হল। খুব ভাব হয়ে গেছে আমার সঙ্গে। আমাকে ওর বাড়ির ঠিকানা দিয়েছে। এই শনিবার যেতে বলেছে খুব করে।

—তোকে যেতে বলেছে ? কোথায় থাকে রে ?

—টালিগঞ্জে। আনোয়ার শা রোডে।

—আমি যে কোন্ একটা সিনেমা ম্যাগাজিনে পড়লাম, ওর বাড়ি নিউ আলিপুরে—

—হ্যাঁ, ওখানে ওর বাড়ি। কিন্তু আনোয়ার শা রোডে ওর একটা ফ্ল্যাট আছে।

—তুই তাহলে যাচ্ছিস সেখানে ?

—দেখি, এখনো ঠিক করিনি কিছু।

—গিয়ে কি করবি ? কবিতা শোনাবি ?

—শোনাতে পারি। সুন্দরী মেয়েদের কবিতা শোনালে কবিরা প্রেরণা পায়। বোদলেয়ার শোনাতেন।

—ও বুঝবে কিছু তোর কবিতা।

—জান্ দু ভাল বুঝত না। তবু বোদলেয়ার তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে নতুন কবিতা লেখার প্রেরণা পেতেন। মেয়েরা কোনকালেই কবিতা বোঝে না—তবু কবিরা যুগে যুগে মেয়েদের উদ্দেশ্য করেই কবিতা লিখে যায়।

—এখন আর মেয়েদের নিয়ে পদ্য লেখার যুগ নেই। এখন সাধারণ মানুষের দুঃখ-টুঃখ নিয়ে লেখ। আর, একটু সোজা করে লেখ—

—দ্যাখ শঙ্কর, জ্ঞান দিসনি। সবাই আজকাল জ্ঞান দেয়। আমিও একজন সাধারণ মানুষ। আমি আমার দুঃখের কথা লিখি।

—ঠিক আছে, তাহলে ঝুমাকে ঐ কথাই বলব।

—ঝুমাকে ? কি বলবি ?

—ঝুমা আমাকে বলেছিল, তোর সঙ্গে দেখা হলে তোকে একবার ওদের বাড়িতে যাওয়ার কথা বলতে। আমি খবর দিয়ে দেবো এখন, তুই ব্যস্ত ! সিনেমা-অ্যাকট্রেসদের কবিতা শোনাচ্ছিস।

—তোকে বেশী ফোঁপর-দালালি করতে হবে না।

—বাঃ, তুই-ই তো বললি। তুই শনিবার ওখানে যাবি—তার আগে তোকে কবিতা-টবিতা লিখে-ফিকে কপি তৈরী করতে হবে না ?

—আমি তো ওখানে যাব কিনা এখনো কিছু ঠিক করিনি !

—যাবি না কেন ? নিশ্চয়ই যাবি । এরকম চান্স কেউ ছাড়ে ? আনোয়ার শা রোডে আলাদা ফ্ল্যাট—সেখানে তোকে নেমন্তন্ন করেছে, আর কেউ থাকবে না নিশ্চয়ই নিভৃতে শুধু দু'জন, ডালিয়া আর অরিন্দম—গ্রান্ড ব্যাপার ! ফিল্ম ওয়ার্ল্ডে একটা নতুন স্ক্যান্ডাল না পড়ে যায় !

ন্যাশনাল লাইব্রেরীর মাঠে অরিন্দম বসে আছে একা । এখনো সন্ধ্যে হয়নি, সাড়ে পাঁচটা বাজে । মেঘলা আকাশ । আশেপাশে বাদামের খোসা ছড়ানো—সময় কাটাবার জন্য বাদাম কিনেছিল, অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গেছে । সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে একটার পর একটা । কার্ড আনেনি অরিন্দম, ভেতরে যেতে পারবে না, বাইরে বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই । সিগারেটের টুকরোটা আঙুলের ডগায় এনে টুসকি মেরে ছুঁড়ে দিল জোরে । সেটা গিয়ে পড়ল উজ্জ্বল লাল রংয়ের কলাবতী ফুলের ঝাড়ে । সেদিকে তাকিয়ে একটুক্ষণ চিন্তা করে অরিন্দম উঠে এগিয়ে গেল । ফুলের ঝাড় থেকে খুঁজে বার করলে জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরোটা । সেটাকে পায়ে চেপে নিবিয়ে ফেলল বাইরে । তারপর আপনমনেই একটু হাসল । অরিন্দম ভাবল, সিগারেটের টুকরো ঘাসের মধ্যে ফেলা আর ফুলগাছে ফেলা একই কথা । এই সব কাঁচা জিনিসে আগুন লাগে না । তবু, ঘাসে সিগারেট ফেললে কিছু মনে হয় না, ফুলবাগানে ফেললে গা-টা কি রকম শিরশির করে । এসবই আমাদের দুর্বলতা । সুন্দর জিনিসের প্রতি মানুষ চিরকালই যুক্তিহীনভাবে দুর্বল ।

একজন ঘড়ি-পরা লোককে ডেকে অরিন্দম সময় জিজ্ঞেস করল ।

অরিন্দম কিছুতেই হাতে ঘড়ি রাখতে পারে না । এর আগে তিনবার ঘড়ি হারিয়েছে । ঘড়ি না থাকার জন্য তার বিশেষ অসুবিধে হয় না, শুধু এইসব সময় মনটা ছটফট করে । ঘড়ি না থাকার জন্য দশ মিনিট সময়কে মনে হচ্ছে এক ঘণ্টা । আরও কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে কে জানে !

আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না । ন্যাশনাল লাইব্রেরীর চওড়া সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল তিনটি মেয়ে । ধীর শান্ত পায়ে হাঁটছে তারা ।

পৃথিবীর আর কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, নিজেদের মধ্যে গল্পে মগ্ন।
মেয়ে তিনটি যখন বেঁকে যাবে, তখন অরিন্দম ডাকল, এই ঝুমা!
ওরা শুনতে পায়নি এগিয়ে যাচ্ছে। অরিন্দম কিন্তু জায়গা ছেড়ে উঠল না, আব একটু জোরে ডাকল, এই ঝুমা! ঝুমা!
তিনজনের একজন দাঁড়াল। অন্য দু'জন না দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে কি যেন বলে চলে গেল।
—এখানে এসো না!
ঝুমা কোন উত্তর দিল না। কিন্তু মাঠের মধ্যেও সে আসবে না বোঝা যায়।
অগত্যা অরিন্দমকে উঠে আসতেই হল। অরিন্দম কাছাকাছি আসতেই ঝুমা হাঁটতে শুরু করেছে।
—বাবাঃ! দু'ঘণ্টা ধরে বসে আছি।
ঝুমা অরিন্দমের দিকে না তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলব না।
অরিন্দম বেশ উৎফুল্ল ভাবেই সঙ্গে সঙ্গে জানাল, ঠিক আছে, বলতে হবে না। আমি শুধু কথা বলব, তুমি স্রেফ শুনে যাবে।
—আমি শুনতে চাই না।
—কান বন্ধ করার কোন সিস্টেম আছে বলে তো জানি না। অবশ্য যদি তুলো-টুলো দিয়ে আটকে রাখো।
—ওসব ইয়ার্কি আমার ভাল লাগছে না।
অরিন্দম ঝুমার হাতের বই দুখানা ঝট্ করে কেড়ে নিয়ে বলল, ঠিক আছে, কিছু শুনতে হবে না, বাড়ি যাও।
—এই, ভাল হচ্ছে না। বই দুটো আমার ভীষণ দরকার।
—দেবো না।
—কি হচ্ছে কি? আমার পড়াশুনো করতে হবে না? পরীক্ষা সামনে—
—আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করলে তুমি পরীক্ষা দিতে পারবে? সব পড়াশুনো গুলিয়ে যাবে।
—আমার বয়ে গেছে। ঠিক আছে। বই চাই না। আমি বাড়ি চলে যাচ্ছি।
ঝুমা হন হন করে এগিয়ে যাচ্ছিল, অরিন্দম তার পাশে এসে নরম গলায়

বলল, শোনো, শোনো। মেয়েরা একটু রাগ করলে খুব ভাল দেখায়। বেশী রাগ করলে কিন্তু আর ভাল দেখায় না। বেশী রাগ হল অলক্ষ্মী। রাগ করলে আবার ক্ষমাও করতে হয়। আমি কি করেছি কি?
—তুমি কিছু করনি। তা ছাড়া, আমি রাগ করলেই বা তোমার কি আসে যায়! আমি একটা অতি সাধারণ মেয়ে—আমি তো আর সুন্দরী নই।
—ঝুমা, শোনো।
—আমার বই দাও, আমি বাড়ি যাব।
বই দুটো এগিয়ে দিয়ে অরিন্দম বলল, নাও।
তারপর আর কেউ একটাও কথা বলল না। পাশাপাশি হেঁটে গেল নিঃশব্দে। লাইব্রেরীর সীমানা ছাড়িয়ে এল চিড়িয়াখানার সামনে বাস স্টপে। যেন কেউ কারুকে চেনেই না।
অরিন্দম সিগারেট ধরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, বাসে এখন দারুণ ভিড়, ওঠা যাবে না।
ঝুমা কোন উত্তর দিল না।
—খানিকটা হেঁটে গেলে চৌরঙ্গী থেকে বাসে ওঠা যেত।
—যার হাঁটতে ইচ্ছে করে, সে হাঁটুক না!
—ঠিক আছে, আমি হেঁটেই যাচ্ছি। আমি এই ভিড়ের বাসে উঠতে পারব না। আমি দিল্লী চলে যাচ্ছি, আর দেখা হবে না।
—বাজে কথা।
—মোটেই বাজে কথা নয়। অফিসের কাজে আমাকে দিল্লীতে যেতে হচ্ছে, অন্তত একমাস থাকতে হবে। তার বেশীও হতে পারে।
—ভালই তো। দিল্লীতে গিয়ে আরও খুব ড্রিঙ্ক করা হবে। কেউ তো সেখানে দেখবার নেই।
—আমি মোটেই ড্রিঙ্ক করি না।
—মিথ্যে কথা বোল না। সেদিন পার্টিতে তুমি ড্রিঙ্ক করনি?
—সে তো একটুখানি!
—একটুখানি? একটুখানি করলে কেউ ঐ রকম হয়ে যায়?
—কী রকম হয়ে গিয়েছিলাম?
—আমি বলতে চাই না। তুমি সেটা ভালই জানো—
—এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝগড়া করবে? তার চেয়ে, ময়দান দিয়ে হাঁটতে

হাঁটতে গেলে হয় না ?

ঝুমা হাঁটতে শুরু করল এবার। কিছুক্ষণ কথাবার্তাহীন হাঁটার পর অরিন্দম আবার জিজ্ঞেস করল, তোমার বুঝি ড্রিংক করা সম্পর্কে খুব ভয় আছে?

—যারা ড্রিংক করে তাদের আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না।

—আগে সেইরকম কারুকে দেখেছ ?

দেখেছিই তো। আমার এক জ্যাঠামশাই ছিলেন, ড্রিংক করতে করতেই তো মরে গেলেন।

—কত বয়েস হয়েছিল ?

—মাত্র আটান্ন।

—কত লোক ঐ বয়েসে এমনিই মরে যায়। আজকের কাগজেই তো আছে একজন বিখ্যাত ডাক্তার আটান্ন বছর বয়সে মারা গেছেন। বুঝলে, ডাক্তাররাও মরে। তোমার জ্যাঠামশাই এমন কিছু নতুনত্ব দেখাননি।

—আমার জ্যাঠামশাই সম্পর্কে ঐরকমভাবে কথা বলবে না বলছি।

যাক গে ওসব কথা। শোনো ঝুমা, আমিও ড্রিংক করতে ভালবাসি না। কিন্তু আমি তো কবি, আমি সব কিছুই পরীক্ষা করে দেখতে চাই। আমি যে-কোন জায়গায় যেতে পারি, যে-কোন মানুষের সঙ্গে মিশতে পারি—যে-কোন খাবার চেখে দেখতে পারি—। মনের মধ্যে সংস্কার থাকলে কবি হওয়া যায় না।

—পৃথিবীতে আরও হাজার হাজার কবি আছে। তারা সবাই তোমার মতন এরকম যা-তা করে বেড়ায় না।

অরিন্দম থমকে দাঁড়াল। এই প্রথম রাগের চিহ্ন ফুটে উঠল ওর মুখে। গম্ভীর গলায় বলল, শোনো ঝুমা, পৃথিবীতে হাজার কেন, লক্ষ লক্ষ কবি আছে। কিন্তু তোমার কাছে আমিই একমাত্র কবি থাকতে চাই। আর কারুর কথা কথা শুনতে চাই না।

ঝুমা এবার হাসল। ঠোঁটে হাসি চেপে রেখে বলল, ইস্‌ অমনি রাগ হয়ে গেল। তুমি যা খুশী তাই করবে—আর আমি একটা কথা বললেই—

—আমি মোটেই যা খুশী তাই করছি না!

—তুমি সেদিন ঐ পার্টিতে গেলে কেন ? আমি তোমাকে বারণ করিনি ? তবু তুমি শুনলে না।

—বাঃ। নিখিল কেন গেল তবে ? তুমি তোমার দাদাকে বারণ করতে

পারনি ?

—আমার দাদা হয়তো আমার কথা শুনবে না। কিন্তু আমি আশা করেছিলাম, একজন অন্তত আমার কথা শুনবে।

একটু গেছি, তাতে কি হয়েছে ? সিনেমার ঐ সব লোকজনকে সামনা-সামনি দেখবার একটু কৌতূহল ছিল।

—কি দেখলে ?

—এমনিই আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতনই। নতুনত্ব আর কি কি থাকবে! এক হিসেবে সব মানুষই নতুন, সব মানুষই আলাদা। এইটুকুই দরকার ছিল জানার। আমি কি ভেবেছিলাম জানো ঝুমা, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার কাছে সব কথা জিজ্ঞেস করবে—কত সব বড় বড় স্টারদের দেখলাম, সামনাসামনি কথা বললাম—মেয়েদের তো এই সব ব্যাপারে খুব উৎসাহ থাকে—

—আমার উৎসাহ নেই। তোমার ছিল, এখন কৌতূহল মিটেছে তো ? আর ঐ সব জায়গায় যেও না।

—এ সব কথা বলো না। যাব না কেন ? যদি আবার কখনো সুযোগ হয়, নিশ্চয়ই যাব। ঐ যে বললাম, মনের মধ্যে কোন রকম সংস্কার রাখতে নেই।

ঝুমার মুখখানা বিষণ্ণ হয়ে গেল। ম্লান সন্ধ্যার ছায়া তার মুখে। মাটির দিকে চোখ রেখে উদাসীন গলায় বলল, সত্যিই তো, আমার কথা তুমি রাখবে কেন ? আমি একটা সাধারণ মেয়ে। তুমি একদিন কত বিখ্যাত হবে, কত লোকজনের সঙ্গে পরিচয় হবে—আমার কথা তুমি গ্রাহ্য করতে যাবে কেন ? এইসব সময় হৃদয়ের যোগাযোগ স্পষ্ট হয়ে যায়। এই রকম সন্ধ্যেবেলা আধো-অন্ধকার প্রায়-নির্জন রাস্তায়। অরিন্দম ঝুমার খুব কাছাকাছি এসে মিনতি করে বলল, ঝুমা, প্লিজ, ওরকম ভাবে বলো না, তুমি তো জানো, তুমি মন খারাপ করলে আমার কী রকম কষ্ট হয়। তোমাকে ছাড়া আর কোন মেয়েকে আমি কখনো ভালবাসতে পারব না।

ঝুমা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থেকে বলল, আমি বিশ্বাস করি না। তোমার এই সমস্ত কথা, আমি আর বিশ্বাস করি না।

—বিশ্বাস কর না ? তুমি আমার মুখের দিকে তাকাও।

—না, তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না।

—আমি তোমার গা ছুঁয়ে বলছি।

ঝুমা তার নরম সুন্দর হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, বলো, ছুঁয়ে বলো।
অরিন্দম ঝুমার হাতখানা চেপে ধরে বলল, তোমাকে ছাড়া আর কোন মেয়েকে ভালবাসা আমার পক্ষে অসম্ভব। তুমি এটা বোঝ না? আমি তোমার জন্য···এ কি ঝুমা, তুমি কাঁদছ?
ঝুমার ঠোঁট কাঁপছে, দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে আসছে চোখ থেকে। তার উনিশ বছরের গ্লানিহীন পরিষ্কার মুখে সরল শংকা।
অরিন্দম ওকে একটু ঝাঁকানি দিয়ে বলল, এই ঝুমা, কি হল কি? তুমি কাঁদছ কেন?
—তুমি যদি কথা না রাখ, তাহলে পৃথিবীতে আর কোন কিছু আমি বিশ্বাস করতে পারব? তুমি সব সময় এত মিথ্যে কথা বলো, হয়তো এটাও তোমার একটা শখের মিথ্যে। তোমার এতে কিছু যায়-আসে না
—কিন্তু আমার···
—ঝুমা, এই সব ব্যাপার নিয়ে কেউ মিথ্যে বলতে পারে? যদি কেউ বলে, সে মানুষ নয়, অমানুষ। আমাকে তুমি তাই ভাবো?
—তুমি আর যাই কর, আমার বিশ্বাসটা নষ্ট কোর না কোনদিন।
—তুমি এখন চোখটা মুছে ফেল তো। লোকে দেখলে কি ভাববে!
কিছুটা পথ ওরা নিঃশব্দে হেঁটে গেল। অরিন্দম তখনও ঝুমার হাত ধরে আছে। একটু বাদে সচেতন হয়ে লজ্জা পেয়ে ঝুমা বলল, এই, হাত ছাড়।
হাত ছেড়ে অরিন্দম ঝুমার কাঁধে হাত রাখল। শরীর মুচড়ে ঝুমা বলল, এই না, ওরকম কোর না।
কথা শুনল না অরিন্দম, তার হাতখানা কাঁধ থেকে নেমে এল পিঠে, তারপর কোমর জড়িয়ে ধরল ঝুমার। ঝুমা নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইছে, মুখে-চোখে সন্তুষ্ট নায়িকার মত ব্রীড়া। দু'চোখে ভিখিরীর মতন তৃষ্ণা নিয়ে অরিন্দম তাকাল ঝুমার নিটোল বুকের দিকে। বার বার কেন চোখ ঐ দিকে চলে যায়? ওখানে কি চুম্বক বসানো আছে? পরীক্ষা করে দেখার উপায় নেই।
ঝুমা অরিন্দমের বাহুতে একটা চিমটি কেটে নিজেকে সরিয়ে নিল।
অরিন্দম বলল, তোমার পরীক্ষা হয়ে গেলে একদিন একটা গোটা দিন আমরা একসঙ্গে কাটাব। ট্রেনে করে কোথাও ঘুরে আসব—যাবে তো?
—যাব। তুমি দিল্লী থেকে কবে ফিরছ?

—দিল্লী ? আমি দিল্লী যাচ্চি না তো !
—যাচ্ছ না ? এই যে একটু আগে বললে, অফিসের কাজে তোমাকে দিল্লী যেতে হবে ?
—ও, হ্যাঁ। একবার একটা কথা হয়েছিল, কিন্তু কোন ঠিক নেই—
—মিথ্যুক কোথাকার ? তোমার সব কথাই মিথ্যে, তাই না ?
—শুধু একটা কথা ছাড়া—একটু আগে যা বললাম।
হঠাৎ এত বেশী আনন্দ হল অরিন্দমের যে, ঝুমার কাছ থেকে দু'টাকা ধার করে বাসের বদলে ট্যাক্সি নিয়ে ফেলল।

॥ ৫ ॥

চন্দননগরে অরিন্দমের মামাবাড়ি। ওর মামারা এককালে বড়লোক ছিলেন, এখন শুধু ভাঙাচোরা বড় একটা বাড়িই রয়েছে, বনেদীয়ানা আর কিছুই নেই। অরিন্দমের বড়মামা তিন-চার রকম ব্যবসা করতে গিয়ে প্রত্যেকটিতেই ফেল মেরে সর্বস্বান্ত হয়েছেন, এখন রেলের অফিসে কেরানীগিরি করেন। ওঁকে দেখলে এখন কেউ বুঝবেই না, এককালে উনি ডজ গাড়ি চেপে ঘুরে বেড়াতেন।
অরিন্দম মাঝে মাঝেই মামাবাড়িতে বেড়াতে আসে। পুরনো আমলের বাড়িতে থাকতে তার ভাল লাগে—অনেক স্মৃতির নিশ্বাস টের পাওয়া যায়। এ বাড়ির সব ঘরে এখন লোক থাকে না, একতলার অনেক ঘরই খালি। অরিন্দম গোটা বাড়িটার ঘুরে বেড়ায়, ছাদে একলা বসে বসে বই পড়ে।
কখনো কখনো খুব গোপনে খাতা খুলে কবিতা লেখে। অরিন্দম কবি হিসেবে খুব অহংকার করে বেড়ায়, কিন্তু কবিতা লেখার সময় খুবই লাজুক। এ বাড়ির ছাদ থেকে গঙ্গা দেখা যায়।
বাড়িটা যে মেরামত করে ভাড়া দেওয়া হবে, সে টাকাও নেই মামাদের। বাগান ও সন্নিহিত জমি আগেই বিক্রী হয়ে গেছে, এখন বাড়িটারও অর্দ্ধেকটা বিক্রী করে দেবার কথা চলছে। সেই জন্য অরিন্দম এখন ঘন ঘন আসে। এ বাড়ি সত্যিই বিক্রী হয়ে গেলে তার খুব মন খারাপ

হবে। পুরনো বাড়ির প্রতি তার একটা টান আছে। এখানে সময়ের গন্ধ পাওয়া যায়।

সেদিন চন্দননগর স্টেশনে নেমে দেখল, প্লাটফর্মে খুব ভিড়। লোকজনের মুখে একটা চাপা উত্তেজনা। অরিন্দম ট্রেন থেকে নামার পর, মনে হল যেন সবাই তার দিকেই তাকিয়ে দেখছে। কি ব্যাপার, বুঝতে পারল না সে। স্টেশনের বাইরে এবং রাস্তাতেও কাতারে কাতারে মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো কোন গোলমাল হয়েছে, পুলিশ কোন এম. এল. এ.-কে অ্যারেস্ট করেছে। অরিন্দম আর মাথা ঘামাল না। একটা সাইকেল রিক্সা নিয়ে নিল।

মামাবাড়িতে এসে অরিন্দমের দুধ-ভাত কিংবা ক্ষীর-সর জোটে না। তবে দিদিমার হাতে রান্না নিরামিষ শুক্তো খেতে তার খুব ভাল লাগে। দিদিমার রান্নাঘরের চৌকাঠে বসে পুরনো দিনের গল্প শোনে। ফরাসী আমলের অনেক গল্প জানেন দিদিমা। আগেকার দিনে বিপ্লবীরাও এসে লুকিয়ে থাকতেন চন্দননগরে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বিপ্লবী গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংয়ের সঙ্গে পুলিসের মারামারি হয়েছিল এই তো কাছেই একটা বাড়িতে।

বড়মামার দুটি ছেলে-মেয়ে, বারো আর চৌদ্দ বছর বয়েস। অন্যদিন অরিন্দম এলেই তারা লাফাতে লাফাতে ছুটে আসে। আজ তাদের পাত্তা নেই। দিদিমার সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করে অরিন্দম ছাদে উঠে গেল। এক কোণে বসল পা ছড়িয়ে। মস্ত বড় ছাদ, এক সময় অনেক টবের ফুলগাছ ছিল—এখন টবগুলো আছে শুধু, ফুল ফোটে না। এখানে এসে বসলে অরিন্দম একটা আলাদা জগতে পেঁৗছে যায়। কবিতার খাতার মধ্যে তার নিজস্ব জগৎ।

রোদ বেশি নেই, আকাশ মেঘলা মেঘলা, বহু উঁচু দিয়ে এরোপ্লেনের মতন দ্রুতগতিতে ছুটে যাচ্ছে কয়েকটা চিল। চিলগুলোর রং কালচে ধরনের। 'সোনালি ডানার চিল' অরিন্দম কখনো দেখেনি। তবু সেরকম কোন চিলের অস্তিত্বের কথা ভাবতে ভাল লাগে। এই রকম ভিজে মেঘের দুপুরে যে সোনালি ডানার চিল কেঁদে কেঁদে উড়ে যায়।

অনেকক্ষণ ধরে কলম কামড়াচ্ছে অরিন্দম। একটা লাইনও লিখতে পারছে না। আজকাল কি যেন হয়েছে, নতুন লেখা আর মাথায় আসে না। এই সময়টা যা বিচ্ছিরি লাগে। যারা কবিতা লেখে না, তারা এই

ব্যাপারটা বুঝতে পারবে না। কোন কবি যখন নতুন কবিতা লিখতে পারে না—সে সময় সে মনে মনে অসুস্থ হয়ে থাকে।

অরিন্দম হঠাৎ খেয়াল করল, কাছেই কোথায় যেন খুব গোলমাল হচ্ছে, সেই জন্যই সে মনোযোগ বসাতে পারছে না। খাতা মুড়ে রেখে অরিন্দম উঠে দাঁড়াল, উঁকি মারল পাঁচিল দিয়ে।

বাড়ির পাশেই যেখানটায় তার মামাদের আগে ফলের বাগান ছিল—এখন বিক্রী হয়ে গেছে, একটা পোলট্রি খোলা হয়েছে—সেখানে হাজার হাজার মানুষের ভিড়। লোকেরা চ্যাঁচামেচি করছে, লাফাচ্ছে, শিস দিচ্ছে—একটা হৈ হৈ ব্যাপার। দু'চারজন পুলিশও আছে— কিন্তু মারামারি খুনোখুনির ঘটনা মনে হয় না, লোকের মুখে-চোখে প্যানিক নেই। কিন্তু কি যে হচ্ছে ওখানে, বুঝতে পারল না অরিন্দম।

ভিড়ের মধ্যে সে তার মামাতো ভাই-বোনদের দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে ডাকল, এই বাবলু। এই মিনু! কিন্তু অত গোলমালে তারা শুনতে পেল না।

একটু বাদে তার মামীমা ছাদে উঠে এলেন। প্রায় দৌড়ে পাঁচিলের কাছে চলে এসে অরিন্দমকে জিজ্ঞেস করলে, তুই দেখতে পাচ্ছিস? আমরা জানলা থেকে ভাল দেখতে পাচ্ছি না।

—কি হচ্ছে ওখানে? পোলট্রির মধ্যে আজ এত লোক কেন?

—ওমা, তুই তা-ও বুঝিসনি? ওখানে 'চোখের আলো' বইয়ের শুটিং হচ্ছে! নাম-করা নাম-করা সব অ্যাকটর-অ্যাকট্রেস এসেছে।

—শুটিং হচ্ছে? তাই বলো! ঐ দেখার জন্যই স্টেশনে, রাস্তায় এত ভিড়! কিন্তু এত লোকজনের মধ্যে কিসের শুটিং?

—সেই তো। দ্যাখ না কাণ্ড। লোকেরা ওদের শুটিং করতেই দিচ্ছে না। কেউ সরবে না, সবাই সামনে থেকে দেখবে? আমরা তো এখনো কারুকে দেখতেই পেলাম না।

—মাইমা, তুমি বাবলু আর মিনুকে ঐ ভিড়ের মধ্যে পাঠিয়েছ?

—পাঠাব কি? ওরা কি কথা শুনবে? ঐ বয়েসের ছেলেমেয়ে, ওরা তো সিনেমার নামে পাগল?

তারপর মাইমা একগাল হেসে বললেন, আমারই ইচ্ছে করছে কাছে গিয়ে দেখতে। চল, যাবি?

—আমার অত শখ নেই। তুমি একলা যাও।

—ধুৎ, তা কি যাওয়া যায়!

এই সময় অরিন্দমের বুড়ি দিদিমাও ছাদে উঠে এলেন। ফোকলা দাঁতে হেসে বললেন, বৌমা, দেখতে পেলে ? উত্তমকুমার এয়েছে ?
—না মা, এখনো দেখতে পাইনি !
অরিন্দম দিদিমাকে বলল, দিদু, তোমারও এত শখ ! সিঁড়ি ভেঙে ছাদে উঠে এসেছ ?
—দাঁড়া ভাই, একটু উত্তমকুমারকে দেখে নিই ! এত নাম-ডাক ।
শুটিংয়ের জায়গায় গোলমাল ক্রমশই বাড়তে লাগল । উত্তাল হয়ে উঠল জনতা। বন্যার মতন আরও মানুষ আসছে। গুজব ছড়াচ্ছে হু-হু করে। কোন্ কোন্ অভিনেতা অভিনেত্রী যে শুটিংয়ে উপস্থিত তাও বোঝার উপায় নেই। লোকের কথা শুনলে মনে হয়, বাংলা ফিল্মের যাবতীয় নায়ক-নায়িকাই আজ চন্দননগরে হাজির। বাবলু আর মিনু মাঝে মাঝে দৌড়ে দৌড়ে এসে টাটকা খবর শুনিয়ে যাচ্ছে।
আর কিছুক্ষণ বাদে শুটিংয়ের দফা একেবারেই গয়া হয়ে গেল। জনতার দাবি, তারা সবাই নায়ক-নায়িকাদের ছুঁয়ে দেখবে। যে-সব নায়ক-নায়িকাদের তারা এত ভালবাসে, যাদের চর্মচক্ষে দেখার জন্য এত কষ্ট করে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের উদ্দেশেই কি অবিরাম খিস্তি-খেউড় ! তারপর ইট-পাটকেল ছোঁড়াছুঁড়ি এবং পুলিসের লাঠি-চার্জ ।
অরিন্দেমের মামাবাড়ির দরজা দিয়ে কারা যেন হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েছে বাড়ির মধ্যে। তাদের মধ্যে নাকি কয়েকজন সিনেমার লোকও আছে। বাবলু আর মিনু চোখ গোল গোল করে বলে গেল, সৌমিত্র চ্যাটার্জি, ডালিয়া দেবী, জহর রায়—এঁরা এসেছেন তাদের বাড়িতে, বসবার ঘরে বসেছেন, তোমরা শিগগীর এসো—।
অরিন্দমরা ছাদ থেকে নেমে এসেছে দোতলায়। বড়মামা ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, কারা এসেছে বলে গেল ? এই অরিন্দম, যাদের নাম বলল, তারা কারা ?
অরিন্দম হেসে বলল, বড়মামু, তুমি তাও জান না ? তুমি কোন্ জগতে আছ ? এরা সব সিনেমার নাম-করা লোক!
—না, না, সিনেমার লোক আমার বাড়িতে আসা আমি পছন্দ করি না। লোকে ঝামেলা করবে। আমি ওদের চলে যেতে বলে দিচ্ছি।
বড়মামীমা ততক্ষণে চাকরের হাতে টাকা দিয়ে মিষ্টি কিনতে পাঠিয়ে দিয়েছেন দোকানে। এবং আলমারি থেকে বেনারসী শাড়ী বার করে

পরতে আরম্ভ করেছেন। স্বামীকে এক ধমক দিয়ে বললেন, চলে যেতে বলবে কি? ও'রা আমাদের বাড়িতে এসেছেন, কত ভাগ্য আমাদের! আর কারুর বাড়িতে আসে? শত ডাকলেও অসবে না!
বড়মামা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তা তুমি হঠাৎ বাড়িতে বসে সাজ-গোজ শুরু করলে কেন?
—বাঃ, আটপৌরে শাড়ী পরে ওদের সামনে যাওয়া যায়! দেখবে চল না, ওরা কী রকম দারুণ দারুণ শাড়ি পরে।
—আমার দেখার দরকার নেই। যদি মাথা ঘুরে যায়।
অরিন্দম বলল, এ কি মাইমা, এক্ষুনি যাচ্ছ কি? স্নো-পাউডার মাখলে না?
—এই, তুই আবার বেশী বেশী করিস না তো! চল, তুই যাবি না?
অরিন্দম বলল, না, আমার দরকার নেই। আমি বড়মামুর সঙ্গে গল্প করছি।
—তুই কী ছেলে রে! এ রকম একটা চান্স পাচ্ছিস! বন্ধুদের কাছে গিয়ে গল্প করতে পারবি!
মিনু ছুটে এসে উত্তেজিত ভাবে বলল, মা, লবঙ্গ আছে? ডালিয়াদি লবঙ্গ খাবেন।
বাড়িতে লবঙ্গ নেই। মামীমা এমন মুখের ভাব করলেন যেন একটা মহা পাপ হয়ে গেছে। স্বনামধন্য ডালিয়া দেবী দয়া করে একটা লবঙ্গ খেতে চেয়েছেন, আর তিনি' সেটা দিতে পারলেন না! তক্ষুনি মামীমা বকাবকি শুরু করে দিলেন তাঁর স্বামীকে।
অরিন্দম বলল, সে কি রে! এর মধ্যে তোর দিদি পাতানো হয়ে গেল!
মিনু বলল, রুণুদা তুমি চল। ও'দের সঙ্গে কথা বলবে না?
—তোর মাকে নিয়ে যা। তুই একটা অন্য ফ্রক পরলি না? কিংবা এই সুযোগে শাড়ি পরে নে—
বড়মামা ব্যাজার মুখে জানলা দিয়ে উ'কি মেরে বললেন, বাড়ির সামনে এখনো লোক গিসগিস করছে। এর কোন মনে হয়!
অরিন্দম বলল, পেছন দিকে একটা দরজা আছে না?
- কিন্তু পেছন দিকেও তো লোক দেখছি। লোকেরা যদি বেশী চ্যাঁচা-মেচি করে—তাহলে আমি স্রেফ ওদের বার করে দেবো।
—আর বড়মামীমা তোমাকে তাহলে একেবারে ভস্ম করে দেবে।

—ওরকম কতবার ভস্ম করেছে সারা জীবনে। বিয়ে কর, তারপর বুঝবি ঠ্যালা।
দিদিমা এসে বললেন, কে কে এয়েছে রে ? উত্তমকুমার এয়েছে ? তাকে যে দেখবার বড্ড ইচ্ছে ছিল।
অরিন্দম বলল, হাঁ, হাঁ, এসেছে। উত্তমকুমার তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। তুমি কাপড় পাল্টে নাও। ভাল কাপড় পর একটা—
—যাঃ মুখপোড়া ! আমাকে আবার সাজতে গুজতে হবে নাকি ?
—হবে না ? উত্তমকুমার হয়তো তোমাকে পছন্দ করে একেবারে সিনেমায় নামিয়ে দেবে। পরের বইতে তুমি নায়িকা। শ্রেষ্ঠাংশে উত্তমকুমার ও কাদম্বিনী দেবী ! যা দারুণ কম্বিনেশন হবে !
ঠাট্টা-ইয়ার্কি সত্ত্বেও দিদিমা গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে গেলেন বসবার ঘরের দিকে। বড়মামা তাঁর মায়ের কাণ্ড দেখে মুখ টিপে হাসলেন। অরিন্দমকে বললেন, একবার কি হয়েছিল জানিস না ? মা একখানা রামকৃষ্ণদেবের ছবি কিনে আনতে বলেছিলেন বাবলুকে। বাবলু আর বেশি পরিশ্রম করেনি—গুরুদাস বাঁড়ুজ্যে বলে যে একজন রামকৃষ্ণদেব সাজে—তার ছবি এনে দিয়েছে। আমি একদিন দেখি, মা ঠাকুরঘরে সিনেমা অ্যাকটরের ছবি টাঙিয়ে পুজো করছেন।
বাবলু এসে অরিন্দমের হাত ধরে টানাটানি করতে লাগল। বলল, রুণুদা তুমি এস। তোমাকে ডালিয়াদি ডাকছেন।
—ভ্যাট, আমাকে ডাকবে কেন ?
—হ্যাঁ, সত্যি ! তোমার কথা ওঁকে বলেছি।
—কি বলেছিস ?
—আমি বলিনি, দিদি বলেছে। দিদি বলেছে, আমাদের রুণুদাও বিখ্যাত লোক। সবাই চেনে। দেশ-এ কবিতা বেরোয়। ও-মাসে একটা বেরিয়েছিল না ?
বড়মামা বললেন, মিনু নিশ্চয়ই এতক্ষণে বাড়ির হাঁড়ির খবর বলতেও বাকি রাখেনি। ওর আঁকা ছবিগুলো দেখায়নি ?
অরিন্দম বাবলুকে বলল, তুই গিয়ে বল, আমি ব্যস্ত আছি। যেতে পারব না।
—কোথায় ব্যস্ত ? তুমি তো এমনি এমনি বসে আছ।
—না, আমি তোর বাবার সঙ্গে দরকারী কথা বলছি।

বড়মামা বললেন, যা একবার ঘরে আয় অরিন্দম। দ্যাখ যদি ওদের এবার বিদায় করার ব্যবস্থা করতে পারিস!
পুরুষ অভিনেতারা অনেকেই চলে গেছে। বাইরের ভিড় অনেকটা পাতলা, কিন্তু ডালিয়া দেবী রাস্তা একেবারে পরিষ্কার না হলে যেতে পারবেন না। বেশী চ্যাঁচামেচি ওঁর নার্ভে সহ্য হয় না।
অরিন্দম এসে দেখল, বসবার ঘরে সেকেলে রং-চটা সোফায় বসে আছে ডালিয়া। ঘর-ভর্তি রকমারি লোক। মিনু আর বাবলুর বন্ধুরা একের পর এক অটোগ্রাফ সই করাচ্ছে ডালিয়াকে দিয়ে। একজন প্রৌঢ় ব্যাজার মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন দরজার কাছে - তিনি সম্ভবত ছবির প্রযোজক কিংবা প্রোডাকশন ম্যানেজার—আজকের শুটিং ক্যানসেল হওয়ায় কত টাকা খরচ হয়ে গেল, তার হিসেব করছেন। কয়েকজন লোককে প্লেটে প্লেটে রসগোল্লা ও চানাচুর দেওয়া হয়েছিল, ডালিয়া মাত্র আধখানা রসগোল্লা খেয়েছে।
বড়মামীমা ডালিয়ার পাশে বসে অনবরত কী সব গল্প করছিলেন, অরিন্দমকে দেখে বললেন, এই যে, এটি আমাদের ভাগ্নে। এর নাম অরিন্দম—ও কবিতা-টবিতা লেখে—
ডালিয়া বিনীতভাবে হাতজোড় করে বলল, নমস্কার। আপনার কথা অনেক শুনলাম—
এর আগে যে কখনো অরিন্দমকে দেখেছে, সে-রকম কোন চিহ্ন ডালিয়ার মুখে নেই। আর দু' একটা কথা বলার পর অরিন্দম বুঝতে পারল, ডালিয়ার সত্যিই মনে নেই তার কথা—অথবা মনে রাখতে চায় না। মাত্র দিন দশেক আগের ঘটনা—কিন্তু ডালিয়া স্মৃতিকে ভারাক্রান্ত করে না। ডালিয়া মিষ্টি হেসে বলল, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন। দেখুন তো, হঠাৎ এসে পড়ে আপনাদের কত অসুবিধে করলাম! বাইরে এমন গোল-মাল শুরু হল—
অরিন্দম কিছু বলার আগেই বড়মামীমা বললেন, না না, অসুবিধে কি! ও কথা বার বার বলছেন কেন? আমাদের কত সৌভাগ্য—আপনার সঙ্গে আলাপ হল—এরপর যখন সিনেমায় দেখব—
মিনু বলল,—আচ্ছা ডালিয়াদি, 'রূপ কি পঞ্জি, চোরোঁ কা রাজা' বইতে আপনার গালে যে একটা তিল ছিল, সেটা নেই কেন?
মিনুর এক বান্ধবী বলল, আচ্ছা ডালিয়াদি, আপনি বুঝি খুব ম্যাড্রাসী

খাবার খেতে ভালবাসেন, না? একটা সিনেমার বইতে লিখেছিল?
আর একটি মেয়ে বলল, আপনি শুধু ইলোরা পাউডার মাখেন, না? কাগজে ছবি দিয়েছে!
আর একজন বলল, ডালিয়াদি, আপনি 'মিষ্টি বাঁশী' বইতে যে পাহাড় থেকে পড়ে গেলেন, সেটা কি সত্যি সত্যি?
বড়মামীমা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি অতজোর ঘোড়া চালাতে পারেন? কি যেন একটা বইতে দেখলাম—ঐ যে, যেটাতে রাজেশ খান্নার স্মৃতি নষ্ট হয়ে গেল—
ডালিয়া অরিন্দমকে বলল, আপনি তো কবিতা লেখেন শুনলাম। কবিদের আমি খুব শ্রদ্ধা করি। কি করে লেখেন আপনারা—
এর আগের দিন কবি শব্দটা শুনে ডালিয়া এমন একটা ভাব করেছিল যেন ও-রকম কোন কথা সে জীবনে শোনেনি। সে জানে শুধু সিনেমার গান-লেখকদের কথা। আর আজ সে একটা গদ্‌গদ্‌ ভাব দেখাচ্ছে! অরিন্দম ভাবল, কোন্‌টা অভিনয়? সেদিন না আজ? আজ ডালিয়া মেক-আপ নিয়ে আছে, আজও চোখের পাতায় নীল রং, গাল দুটি পালিশ করা চকচকে, আঙুলের নোখগুলো এমন লাল যে মনে হয়, কারুর হৃদয় চিরে রক্ত মাখিয়েছে। তবে, মেয়েটা সত্যি সুন্দর, ওঃ অসহ্য রকমের সুন্দর!
অরিন্দম লাজুক ভাবে বলল, আমি এমন কিছু লিখি না—এই সামান্য, বিশেষ কেউ পড়ে না—
ডালিয়া মুগ্ধদৃষ্টিতে বলল, আমার কবিতা পড়তে খুব ভাল লাগে।
এটা যে কত বড় মিথ্যে কথা, সেটা বুঝতে অরিন্দমের এক মুহূর্ত'ও দেরী হল না। তবু মিথ্যে কথাও কত মোহময় হয়। এই সব মিথ্যে কি ভীষণভাবে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়!
অরিন্দম একবার ভাবল, সেদিনকার কথাটা মনে করিয়ে দেবে কি না! ডালিয়া সেদিন অরিন্দমকে অপমান করেছিল। আজ অরিন্দম অনায়াসেই ডালিয়াকে অপমান করতে পারে, বাড়ি থেকে তাড়িয়েও দিতে পারে। বড়মামার হুকুম আছে। কিন্তু অরিন্দম তা পারবে না। ডালিয়া যে সুন্দর! অরিন্দম কবি, সে সুন্দরের পূজারী।
ভক্তদের কান-ছালাপালা প্রশ্নে ডালিয়া বিরক্ত হয়ে গেছে। তাই সে অরিন্দমের সঙ্গে কথা বলে মনোযোগ ফেরাতে চায়। জিজ্ঞেস করল,

আপনি আপনার কবিতার বই পাবলিশ করেছেন ? কারা পাবলিশার ?
অরিন্দম তার কবিতার বইটা নিজেই ছাপিয়েছে। পয়সা দিয়েছে বন্ধুরা। সে কথা বলল না। বলল, হ্যাঁ, আমার দুটো বই আছে—নতুন পাবলিশার—
ডালিয়া এবার সেই প্রৌঢ়ের উদ্দেশে জিজ্ঞেস করল, গাড়ি এসেছে ? আমি কিন্তু এ রকম আউটডোর শুটিংয়ে আর আসব না।
প্রৌঢ় বললেন, গাড়িটা সরিয়ে রাখতে বলেছি। গাড়ি দেখলে ভিড় আর কমবে না। এরপর সব সেট বানিয়েই করতে হবে—
ডালিয়া অরিন্দমের দিকে ফিরে বলল, আউটডোর করা আজকাল ভীষণ ঝামেলা। বম্বেতে কিন্তু এতটা হয় না। এখানে আউটডোর থাকলেই—
হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে ডালিয়া বলল, আপনাদের কিন্তু অনেক সুবিধে। বাড়িতে বসে বসে লিখলেই হয়। আমাদের কিন্তু খাটুনি অনেক। তা ছাড়া ফ্যানদের জ্বালায় রাস্তায় বেরুবার উপায় নেই !
ডালিয়া এমন ভাবে বলছে, যেন এই মুহূর্তে সে অরিন্দমের সঙ্গে পেশা বদল করতে চায়। যেন, জোর করে কেউ তাকে সিনেমায় আটকে রেখেছে। অরিন্দম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে ডালিয়াকে। পায়ের নোখ থেকে মাথার চুল। তার বুকের মধ্যে অসম্ভব তীব্র আনন্দ। এই মেয়েটির সঙ্গে একটু কথা বলার জন্য একদিন সে অপমানজনক পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছিল। আজ ঘটনাচক্রে হলেও সেই মেয়েটিই তার সঙ্গে কথা বলার আগ্রহ দেখাচ্ছে কত।
ডালিয়া বলল, জানেন, ছেলেবেলায় না, আমার দাদামশাই রোজ আমাকে রামায়ণ পড়ে শোনাতেন। আমার অনেকখানি মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। আমার এক কাকা খুব সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করতেন। আমিও কত কবিতা পড়তাম। এখন সময় পাই না। এখন ডেট দিতে দিতে কত কাজ করার সময় পাই না - এমন দুঃখ হয় মাঝে মাঝে—
অরিন্দম আস্তে আস্তে বলল, আপনারা যদি কবিতা পড়েন, কবিরা কত প্রেরণা পায় তা হলে। পড়া উচিত আপনাদের।
—আপনি শোনাবেন ? সত্যি, একদিন শোনাবেন আমাকে ?
অরিন্দম উত্তর দেবার সময় পেল না। বাইরে আবার একটা গোলমাল শোনা গেল। কয়েকজন বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আবার কয়েকজন

ফিরে এসে বলল, স্বয়ং পুলিসের এস-পি গাড়ি নিয়ে এসেছেন। আর কোন অসুবিধে নেই। এবার অনায়াসে যাওয়া যাবে। যে লোকটি খবরটা দিল, তাকে অরিন্দম আগে দেখেছে। ঐ লম্বা লোকটির নাম বিকু। একটু আড়ষ্ট হয়ে গেল অরিন্দম।

ডালিয়া উঠে সাড়ম্বরে বিদায় নিল সবার কাছ থেকে। বড় মামীমার কাছে এসে এমন বিনয় প্রকাশ করল, তিনি তো একেবারে গলে জল। অরিন্দম চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল দরজার কাছে।

ডালিয়া চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ অরিন্দমের দিকে চোখ পড়তে কি ভেবে এগিয়ে এল কয়েক পা। মধুর হেসে বলল, চলি! খুব জ্বালিয়ে গেলুম আপনাদের।

—না না, ও কথা বলছেন কেন?

—এই যে আজ আলাপ হল, মনে থাকবে তো আমার কথা?

—নিশ্চয়ই!

—সত্যি মনে আছে বুঝতে পারব, যদি কখনো দেখা করতে আসেন। আপনার কবিতা শোনার ইচ্ছে রইল—

—আপনারা কত ব্যস্ত থাকেন। আমরা শুধু শুধু গিয়ে আপনাদের বিরক্ত করব—

—বিরক্ত কেন হব? আসুন একদিন। কবে আসবেন, বলুন?

—দেখি, যদি কখনো সুযোগ হয়—

—দেখি-টেখি না। সামনের মাসে আমাকে আবার বম্বেতে যেতে হবে। এক কাজ করুন, এন·টি দু' নম্বরে আমার পর পর দশদিন ডেট আছে। তার মধ্যে একদিন আসবেন?

—আমি স্টুডিওতে কখনো যাইনি। ওসব জায়গা চিনি না।

কিচ্ছু অসুবিধে হবে না। আমার আলাদা ঘর আছে—আচ্ছা, এক কাজ করুন, সামনের শনিবার আমার মাত্র এক ঘণ্টা কাজ—তারপর অনেক সময় পাওয়া যাবে। সেদিন আসুন না! আপনি আপনার নাম বলে খবর পাঠাবেন—ঠিক আসবেন, আমি অপেক্ষা করব কিন্তু!

—আমার নাম মনে থাকবে আপনার?

অরিন্দমকে অবাক করে দিয়ে এবং অসাধারণ স্মৃতিশক্তির পরিচয় দিয়ে ডালিয়া বলল, বাঃ, মনে থাকবে না কেন? আপনার নাম তো অমিতাভ মুখার্জী—

অরিন্দমকে কিছু বলতে হল না। মিনু, বাবলু এবং তার বন্ধুরা সমস্বরে চেঁচিয়ে বলতে আরম্ভ করল না না, মুখার্জী নয়, লাহিড়ী। অমিতাভ নয়, অরিন্দম! অরিন্দম!

একটুও লজ্জা না পেয়ে ডালিয়া বলল, অরিন্দম লাহিড়ী তো! ঠিক মনে থাকবে। তাছাড়া আপনাকে দেখলেই চিনতে পারব।

পুরো দলবল চলে যাবার পর বাড়ির সবাই বহুক্ষণ ঐ আলোচনায় ব্যস্ত। পুরুষ অভিনেতা কয়েকজনকে ভালোভাবে দেখা হল না বলে আফসোস থাকলেও বিখ্যাত নায়িকা ডালিয়ার শাড়ী, ব্লাউজ ও গয়নার ডিজাইন সম্পর্কে গল্প আর শেষই হয় না।

অরিন্দম বড়মামাকে বলল, বড়মামু, দেখলে তো, আমি গিয়ে কত তাড়াতাড়ি ওদের বিদায় করে দিলুম। না হলে যেতেই চাইছিল না।

॥ ৬ ॥

এর আগের বার শংকরের কাছে মিথ্যে কথা বলেছিল, কিন্তু এবার সত্যি সত্যি ডালিয়া তাকে দেখা করার জন্য অনুরোধ করেছে এবং কবিতা শোনাতে বলেছে। পৃথিবীতে অনেক অবিশ্বাস্য ব্যাপারও সত্যি হয়।

অরিন্দম অবশ্য ঠিক করে রেখেছে সে যাবে না। তবু কথাটা ডেকে ডেকে সবাইকে শোনাতে ইচ্ছে করছে। বন্ধুবান্ধবদের সামনে এখন সে অনায়াসেই তাচ্ছিল্য দেখিয়ে বলতে পারে, তোরা যার নাম শুনে পাগল হয়ে যাস্, সেই ডালিয়া নিজে আমাকে দেখা করার জন্য রিকোয়েস্ট করেছে। তবু আমি যাব না। আমি ঐ সব সিনেমার মেয়েদের পাত্তা দিই না।

মুশকিল হচ্ছে এই যে, বন্ধুরা কেউ বিশ্বাস করে না। অরিন্দম এর আগে এত কিছু বানিয়ে বানিয়ে বলেছে যে, এখন এই ডাহা সত্যি কথাটাও তাদের বিশ্বাস হয় না। মামাবাড়ির সবাই সাক্ষী আছে, কিন্তু তাদের তো ডেকে এনে ভজিয়ে দেওয়া যায় না সবার কাছে। বন্ধুদের কাছে কথাটা প্রমাণ করার জন্যই এক একবার অরিন্দমের ইচ্ছে হয় গিয়ে দেখিয়ে দিতে। কিন্তু না, সে যাবে না। সেই শনিবার ডালিয়া নিশ্চয়ই তার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। করুক?

ঝুমার পরীক্ষা খুব কাছে, আর দেখা করা যায় না। সময় কাটতে

চায় না অরিন্দমের। সন্ধ্যেবেলা একা একা ঘুরে বেড়ায়। আগে তার সিনেমা দেখার অভ্যেস ছিল না একেবারে। এখন সে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে লুকিয়ে প্রায়ই সিনেমা দেখতে যায়। ট্রামে-বাসে কিংবা অফিসে যখন সিনেমার আলোচনা হয়, অরিন্দম কান পেতে শোনে। কেউ ডালিয়ার নামটা উচ্চারণ করলেই অরিন্দমের ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে। আহা, বেচারারা তো জানে না, ঐ সর্বজন-আরাধ্যা ডালিয়া এই শনিবার দিন অরিন্দমের জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকবে।

শনিবার যত এগিয়ে আসে, অরিন্দমের মনটা তত দুর্বল হয়ে যায়। সারাদিন ঘুরে-ফিরে ঐ এক চিন্তা। একটা ছবি তার চোখে ভেসে ওঠে। ভেলভেট দিয়ে মোড়া চেয়ারে রাণীর মতন ভঙ্গিতে বসে আছে ডালিয়া। তার চোখে-মুখে ব্যগ্র কৌতূহল। আর কাছেই একটা নিচু জায়গায় বসে অরিন্দম কবিতা পড়ে শোনাচ্ছে। কবিতা শুনতে শুনতে মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে ডালিয়ার মুখের ভাব। শেষ হবার পর একটা দিব্য আনন্দ ফুটে উঠল সেই মুখে। একটা হাত বাড়িয়ে দিল অরিন্দমের দিকে। হাতটা অরিন্দমের কাঁধে রাখল। স্বয়ং বাগ্‌দেবী যেন করছেন কবিকে আশীর্বাদ। ধন্য হয়ে গেল কবির জীবন।...অরিন্দম জোর করে ছবিটা মুছে দেয়।

একটা পত্রিকা-অফিসে অরিন্দম কবিতা দিতে গেল অফিস পালিয়ে। সম্পাদকের সঙ্গে তার সামান্য চেনাশুনো হয়ে গেছে। সম্পাদকের ঘরে চারখানা চেয়ার—তাতে চারজন লোক বসে আছেন। তাঁদের মধ্যে এক জনকে চিনতে পারল অরিন্দম, বিখ্যাত ঔপন্যাসিক তারক মজুমদার। তারক মজুমদার অবশ্য অরিন্দমকে চেনেন না। তিনি অত বড় ঔপন্যাসিক হয়েছেন, কবিতা-টবিতা পড়ার দরকার নেই তাঁর।

অন্যান্য দিন সম্পাদক মশাই অরিন্দমকে বসতে বলেন, দু' একটা কথাটথা বলেন। আজ সব ক'টা চেয়ার ভর্তি, তা ছাড়া বিখ্যাত ঔপন্যাসিকের উপস্থিতিতে তিনি খুব ব্যস্ত।

অরিন্দম ঘরে ঢুকে সসঙ্কোচে দাঁড়াল। এত লোকের সামনে তার কবিতাটা পকেট থেকে বার করতেও লজ্জা হল। সম্পাদক মশাই জিজ্ঞেস করলেন, কী খবর অরিন্দম?

অরিন্দম কবিতার কথাটা বলতেই পারল না। ঘাড় চুলকে বলল, না, কিছু না। এমনিই এদিকে এসেছিলাম, আপনার আপনার সঙ্গে দেখা করে গেলাম।

—ও, আচ্ছা। লেখা-টেখা কি রকম চলছে? দিয়ে যেও একটা। এখন অবশ্য অনেক কবিতা জমে আছে—
হ্যাঁ, দিয়ে যাব। পরে দিয়ে যাব।
প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক বললেন, বুঝলে অমুক, সাহিত্য অ্যাকাদেমি থেকে আমাকে লিখেছে—
সম্পাদকের ঘর থেকে বেরিয়ে রীতিমত রাগে জ্বলতে লাগল অরিন্দম। কেউ তার সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার করেনি, তবু তার রাগ। তার মতন একজন প্রতিভাবান কবি ঐ ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়েছিল, সবার উচিত ছিল তার দিকে মনোযোগ দেওয়া, তার সম্পর্কে কথা বলা। তারক মজুমদার এমন ভাব দেখাচ্ছিলেন, যেন তিনি সব! কবিরা যেন ভিখিরি! একদিন এমন মজা দেখিয়ে দেবো—
সেখান থেকে অরিন্দম গেল রেডিও-অফিসে। তার এক কবি বন্ধুর মুখ থেকে শুনেছিল, রেডিও-অফিস থেকে নাকি তাকে কবিতা পড়ার ডাক পাঠিয়েছে। সেই বন্ধু নিজে দেখেছে, ওদের ফাইলে অরিন্দমের নাম লেখা। কিন্তু অরিন্দম কোন চিঠি পায়নি। হয়তো ওরা ঠিকানা গণ্ডগোল করেছে, কিংবা ডাক-বিভাগকেই বা বিশ্বাস কি!
রেডিও-অফিসে গিয়েও অরিন্দমকে নিরাশ হতে হল। রেডিওতে কবিতা পড়লে কয়েকটি টাকা পাওয়া যেত, তাও ফসকে গেল। রেডিও-অফিসে অরিন্দমের এক দূর-সম্পর্কের কাকা সামান্য কেরানীর চাকরি করেন। তাঁকে ধরার পর তিনি খবর আনলেন যে অরিন্দমের নামে প্রোগ্রামের চিঠি গিয়েছিল ঠিকই—কিন্তু অরিন্দম ফর্ম ফিল-আপ করে পাঠায়নি—তারিখ পার হয়ে গেছে।
কিন্তু আমি তো সে চিঠি পাইনি!
—তাহলে কি হবে, তারিখ পার হয়ে গেছে, আর কিছু করা যাবে না। আবার ছ'মাস বা এক বছর বাদে।
—কিন্তু এটা অন্যায়। চিঠি আমার কাছে পৌঁছোয়নি, সেটা আমার দোষ নয়। ওদের উচিত আবার চিঠি পাঠানো!
—কিন্তু নিয়ম হচ্ছে নিয়ম। তার তো আর কিছু করা যাবে না!
তারপর অরিন্দমের কাকা সস্নেহে ভর্ৎসনার সঙ্গে বললেন, ওসব কবিতা-টবিতা লিখে কি হবে? ওতে কি টাকা-পয়সা হয়? শুধু শুধু বোকার মতন সময় নষ্ট। গল্প টল্প লেখ! একটা গল্প যদি সিনেমায় লেগে

যায়—। তাও যদি না পারিস, গান লেখ না রেডিওর জন্য। তিরিশ টাকা করে দেয় শুনেছি—

অরিন্দম অম্লানবদনে বলল, আমি তো একটা উপন্যাস লিখেছি। শিগগিরই অমুক কাগজে ধারাবাহিক ভাবে ছাপা হচ্ছে।

কাকা উৎসাহিত হয়ে বললেন, তাই নাকি? পয়সাকড়ি দেবে?

হ্যাঁ, দেড় হাজার টাকা দেবে বলেছে।

—ভাল, ভাল। খুব ভাল। ঐ টাকা পেলে তোর মাকে কোন তীর্থ ঘুরিয়ে আনিস। বৌদির কত শখ ছিল পুরীতে গিয়ে জগন্নাথ দর্শন করার—

—মাকে তো আমি এই পুজোর সময় মথুরা-বৃন্দাবন নিয়ে যাচ্ছি। তাছাড়া গ্রামোফোন কোম্পানি আমার দুটো গান নিয়েছে—ওরাও পাঁচশো টাকা দেবে।

—এত টাকা দেয় নাকি?

—প্রথম বলে এখন তো তবু কম দিচ্ছে। পরে আরও বেশি দেবে—

ওর কাকা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন সব কথা। অরিন্দমও যা মনে আসে বলে গেল টকাটক। এসব বলার সময় তার মুখের একটা রেখাও কাঁপে না।

রেডিও-অফিস থেকে বেরিয়ে অরিন্দমের রাগ আরও বেড়ে গেল। বেশি রাগ হল কাকার ওপরে। অরিন্দমের কাকা একটু ধর্মভীরু লোক। পুজো-আচ্চা করেন, বেদ-উপনিষদের কথা তুলে মাতামাতি করেন। অরিন্দম মনে মনে বলল, বেদ-উপনিষদ কত যে পড়েছেন, তা তো বোঝাই যাচ্ছে! বেদ-উপনিষদে কবিদের কত সম্মান করা হয়েছে। বলা হয়েছে তারা স্রষ্টার সমান। অপার এই খলু সংসারে কবিরাই প্রজাপতি —একথা লেখা নেই?

অবশ্য কাকাকে শুধু দোষ দিয়ে কি হবে? এই সমাজ, এই সংসার—কেউই তো কবিদের কোন মূল্য দেয় না। অথচ এই যুদ্ধোন্মাদ, ব্যবসায়ী, হিসেবী, স্বার্থপর পৃথিবীর মানসিক ভারসাম্য তো ঠিক রেখেছে কবিরাই। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অরিন্দম নিজের কবিতার লাইন বিড় বিড় করতে লাগল:

> জীবন আমার মায়া-বন্ধনহারা,
> হরিণ কি জানে কোন্ দিকে ধ্রুবতারা?

ঝুমার পরীক্ষা শুরু হয়েছে বৃহস্পতিবার। অরিন্দম গেল টিফিনে দেখা করতে।

আর দু' একটি কেন্দ্রে পরীক্ষা লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে, কিন্তু ঝুমাদের কেন্দ্রে পরীক্ষা মোটামুটি নির্বিঘ্ন। ঝুমার খুব ভয়, যদি তাদেরও পরীক্ষা বন্ধ হয়ে যায়। এই পড়াশুনোর বোঝা আর সে টানতে পারছে না।

ডাবে চুমুক দিয়েও শেষ করতে পারল না ঝুমা। অরিন্দমকে দিয়ে বলল, তুমি খেয়ে নাও বাকিটা। আমি ভেতরে যাই।

অরিন্দম বলল, এরই মধ্যে ভেতরে যাবে কি? আরও তো কুড়ি মিনিট সময় আছে।

ঝুমা বলল, ভেতরে গিয়ে বইগুলো একটু উল্টে দেখি। দুটো কোশ্চেনের আনসার এখনও রিভাইজ করা হয়নি।

—রিভাইজ করার দরকার কি? বই দেখে টুকে দিও।

—তার মানে?

—সবাই তো আজকাল টোকে। তুমি টুকবে না?

—ছিঃ, তোমার লজ্জা করল না বলতে? আর যে-ই টুকুক, আমি টুকবো না—এটা তোমার জানা উচিত। চলি!

—এইখানেই বসে বসে পড়ো।

—তোমার সামনে পড়া হবে না। শোনো, তুমি আর এসো না!

—তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসব না?

গাঢ়ভাবে তাকিয়ে ঝুমা বলল, তোমাকে দেখলে আমার পড়া গুলিয়ে যায়। পরীক্ষার ক'টা দিন তুমি এসো না, প্লীজ!

—তাহলে দশ দিন দেখা হবে না?

—দশটা দিন দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

কিন্তু দশটা দিন দূরের কথা, অরিন্দমের একটা দিনও কাটতে চায় না। সময় অসম্ভব লম্বা হয়ে গেছে। অফিস থেকে বেরিয়ে বিকেলটা চট করে সন্ধ্যে হয়ে যায়—তারপর সেই সন্ধ্যে অনেকক্ষণ পর্যন্ত চলে।

আর, কলকাতায় সন্ধ্যেবেলাটাই সবচেয়ে মন খারাপ লাগে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে অনেক রাত হয়ে গেলেও ঘুম আসে না অরিন্দমের। দেয়াল ঘড়ির টং টং আওয়াজ একের পর এক শুনতে পায়। মাথার মধ্যে খালি ঘোরে শনিবারের কথা। আর একদিন বাদেই শনিবার। একজন অপেক্ষা

করে থাকবে। অরিন্দম যে যাবে না, সেজন্য ভদ্রতা করে একটা খবর পাঠানো তো উচিত।
আস্তে আস্তে অরিন্দমের মন বদলে যায়। নিজের সঙ্গে তর্ক করে। কেনই বা যাব না? কী দোষ হবে গেলে? একজন কবিতা শুনতে চেয়েছে অত আগ্রহ করে—ক'জনই বা শুনতে চায়! ফিল্ম-অ্যাকট্রেস হলেই কি কবিতা শুনবে না? সবাই তো আর একরকম নয়। তাছাড়া ডালিয়া তো বললই, ছেলেবেলা থেকেই ওদের বাড়িতে কবিতার চর্চা ছিল।
কিংবা ও যদি কবিতার মানে না-ও বোঝে, তাতেও কিছু যায় আসে না। এমনিতেই অরিন্দমের কবিতা পড়তে ভালো লাগে। তার ওপর ঐরকম একটি সুন্দরী মেয়ের সামনে বসে যদি পড়া যায়! এরকম সুযোগ ক'জন পাচ্ছে? ঝুমাও রাগ করতে পারবে না—কারণ সে নিজেই এখন তার সঙ্গে দেখা করতে বারণ করেছে।

ট্যাক্সিওয়ালা স্টুডিওর নাম শুনেই খুব খুশি। মহা উৎসাহে অরিন্দমের সঙ্গে সে অনেক গল্প করতে লাগল। ট্যাক্সিওয়ালা তরুণ শিখ, কিন্তু বেশ বাংলা জানে—বাংলা ফিল্মের হিরো এবং হিরোইনদের নাম তার মুখস্থ। কবে কখন কোন্ কোন্ বিখ্যাত লোককে তার ট্যাক্সিতে চড়িয়েছে, সেই সব কথা বলল সবিস্তারে। তারপর সে অরিন্দমকে জিজ্ঞেস করল, আপনি স্যার নতুন চান্স পেয়েছেন? মেইন পার্ট না সাইড পার্ট?
অরিন্দম গম্ভীরভাবে বলল, আমি অভিনয় করি না। মিউজিক দিই।
—কি দ্যান?
—মিউজিক ডাইরেক্টার কাকে বলে জানো? আমি হচ্ছি তাই।
ট্যাক্সিওয়ালা দারুণ উল্লসিত। মুকেশ ও মান্না দে-র সে খুব ভক্ত। আর মহম্মদ রফি তো তার গুরুর মতন। সে জিজ্ঞেস করল, স্যার, আপনার নাম কি?
অরিন্দম অম্লানবদনে বলল, রাহুল দেব বর্মণ।
স্টুডিওর গেট বন্ধ, কিন্তু ট্যাক্সিওয়ালা অভিজ্ঞ। সে-ই দরজা খোলাল। ট্যাক্সিটা নেবার জন্য নিজেকেই ধনবাদ দিল অরিন্দম। এই পর্যন্ত আসার

পর তার খেয়াল হল, তাকে তো গেটে নাও ঢুকতে দিতে পারত। ডালিয়ার নাম শুনলেই কি ছেড়ে দিত তাকে? তাহলে তো যে-কেউ এসেই ঢুকে পড়তে পারে।

ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়ে অরিন্দম এদিক-ওদিক ঘুরতে লাগল। মস্তবড় এলাকা। অনেক লোকজন ব্যস্ত হয়ে আসা-যাওয়া করছে, কিন্তু তাদের মধ্যে সিনেমার কোন চেনা-মুখ নেই। কেউ অরিন্দমকে গ্রাহ্য করছে না, কেউ কথা বলছে না তার সঙ্গে।

অরিন্দম কিছুক্ষণ ঘুরেও বুঝতে পারল না, শুটিং আসলে কোথায় হয়। সব স্টুডিওতেই ফ্লোর বলে একটা ব্যাপার থাকে, অনেক জায়গায় সে পড়েছে, কিন্তু সেই ফ্লোর ব্যাপারটা কোথায়? এক জায়গায় খানিকটা বাগান, ছোট্ট একটা পুকুর, তার পাশে পেল্লায় পেল্লায় চালের গুদামের মতন কয়েকটা স্ট্রাকচার। এর মধ্যে থেকে ডালিয়াকে খুঁজে বার করা অরিন্দমের পক্ষে সম্ভব নয়।

একটু দূরে একটা লোককে আসতে দেখে অরিন্দমও হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল। তারপর হন্তদন্ত ভঙ্গি করে লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, ডালিয়া কোথায় গেল? ডিরেক্টর খুঁজছেন।

লোকটা মুখ-ঝামটা দিয়ে বললে, কে জানে কোথায়! সেই সঙ্গে সে একটা খারাপ গালাগালও উচ্চারণ করল। খুবই বিরক্ত।

লোকটা হন হন করে চলে গেল। অরিন্দমের এই প্রক্রিয়াটা কাজে লাগল না। আর একটা উপায় খুঁজতে লাগল। এমনি এমনি ডালিয়ার কথা জিজ্ঞেস করলে হয়তো কেউ পাত্তাই দেবে না। অনেকেই নিশ্চয়ই ডালিয়ার খোঁজ করে।

একটা ঘরের মধ্যে চার পাঁচজন লোক বসে ভাঁড়ের চা খাচ্ছে। কি যেন একটা গোপন কথায় তারা ব্যস্ত।

অরিন্দম একটুক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে লোকগুলোকে লক্ষ্য করল। তারপর ভেতরে ঢুকে ভুরু কুঁচকে ভারিক্কী চালে বলল, আচ্ছা, ডালিয়া দেবীকে দয়া করে একটু বলে দেবেন যে আমি চলে যাচ্ছি!
একজন লম্বা চেহারার লোক মুখ তুলে অবাক হয়ে তাকিয়ে বললে, কেন, চলে যাবেন কেন?
—আমার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল, অথচ ওঁর পাত্তাই পাচ্ছি না।
সেই লোকটি অন্য লোকদের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। তারপর

বলল, আচ্ছা, আপনি বসুন। আমি দেখছি।
লোকটি উঠে গেল, বাকি লোকেরা আবার ব্যস্ত হয়ে গেল নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায়। অরিন্দম একটু কান খাড়া করে শুনে বুঝতে পারল, ওরা সেদিন চন্দননগরে আউটডোর শুটিং পণ্ড হওয়ার বিষয়েই কথা বলছে। আহা, ওরা জানে না, সেদিন অরিন্দমের মামার বাড়িতেই ওরা আশ্রয় নিয়েছিল।
সেই লোকটি ফিরে এসে বলল, আপনি পাঁচ মিনিট বসুন। উনি মেক-আপ তুলছেন।
ডালিয়া তাহলে কাছাকাছিই কোথাও আছে। অথচ অরিন্দম এতক্ষণ খোঁজাখুঁজি করেও পায়নি।
লম্বা লোকটি অরিন্দমকে জিজ্ঞেস করল, আপনার স্যার কোন্ কাগজ?
অরিন্দম ঠিক বুঝতে পারল না। সতর্কভাবে বলল, কি বললেন?
—আপনি কোন্ কাগজ থেকে আসছেন?
এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে অরিন্দমের এক মুহূর্তও দেরি হয় না। ভুরু ও ঠোঁটে খানিকটা অহংকার ফুটিয়ে বলল, টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া। আমি ওদের ক্যালকাটা রেপ্।
অন্য লোকগুলো কথা থামিয়ে দিয়েছিল! তাদের মধ্যে বোকাসোকা ধরনের একজন জিজ্ঞেস করল, ক্যালকাটা রেপ্ মানে?
অরিন্দম তার দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, রেপ্ মানে রিপ্রেজেনটেটিভ।
অরিন্দম ইংরিজি কাগজের নাম বলেছে, তাই ওদের মুখে-চোখে একটু সম্ভ্রমের ভাব ফুটে উঠল। একজন জিজ্ঞেস করল, স্যার, আপনাদের কাগজে তো বাংলা ছবির খবর বড্ড কম দেন!
অরিন্দম ধমকের ভঙ্গিতে বলল, গত সপ্তাহেই তো এক কলম কভারেজ ছিল। কাগজ পড়েন মন দিয়ে?
লোকগুলো আমতা আমতা করতে লাগল। অরিন্দম টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া কাগজটা কোনদিন চোখেই দেখেনি।
লম্বা মতন লোকটি বলল, আপনি এবার যান। এতক্ষণে হয়ে গেছে।
অরিন্দম উঠে দাঁড়িয়ে খুব বিনীতভাবে বলল, আপনি দয়া করে জায়গাটা একটু দেখিয়ে দেবেন?
অত্যন্ত অহংকারী লোক হঠাৎ বিনীত হয়ে গেলে লোকে মুগ্ধ হয়ে যায়।

অরিন্দমের ব্যবহার সেই রকম। টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়ার গর্বিত প্রতিনিধি এমন নম্রভাবে কথা বলছে একজন সাধারণ লোকের সঙ্গে।
লম্বা লোকটি বলল, আসুন।
একটা মস্তবড় লোহার পাতের দরজার মাঝখানে আবার কাটা দরজা। নিচু হয়ে সেখান দিয়ে ঢুকতে হয়। খানিকটা উঠোনের মতন, তারপর একটা ঘরের ভেতর দিয়ে রাস্তা—পরে একটি ঘর দেখিয়ে লম্বা লোকটি বলল, ঐ যে, ঐ ঘরে। চলে যান—
অরিন্দম বলল, ধন্যবাদ আপনাকে।
খুব ছোট্ট একটা ঘরে বসে আছে ডালিয়া। সামনে আর দু'জন লোক। আর কোন চেয়ার নেই।
ডালিয়া অরিন্দমের দিকে তাকাল। তারপর বলল, ও, এই যে, আসুন। বসুন। এই, তোমরা বসতে দাও না ওঁকে।
অন্য লোক দুটি বলল, ঠিক আছে, আমরা একটু পরে আসছি।
একটা ঘাগরা ও কাঁচুলি পরে আছে শুধু ডালিয়া। পায়ে নূপুর বাঁধা, সারা গায়ে অনেক গয়না, বুকের কাছে একটা তোয়ালে জড়ানো। নাচের পোশাক, খুব সম্ভবত একটু আগেই নেচেছে, কারণ তোয়ালে দিয়ে আলতো ভাবে ঘাম মুছছে। মেক-আপ তোলা হয়নি, মুখখানা দেখলে তাকে রক্তমাংসের মানুষ মনে হয় না। মনে হয়, মানুষেরই তৈরি একটা চমৎকার পুতুল। একটা লম্বা সিগারেট-হোলডারের ডগায় সিগারেট বসিয়ে ডালিয়া আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছাড়ছে নাক দিয়ে।
ডালিয়া মিষ্টি করে বলল, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন!
অরিন্দম হঠাৎ খুব লাজুক হয়ে গেছে। মেয়েদের একেবারে সামনা-সামনি এসে এই দুর্বলতাটা সে এড়াতে পারে না। ডালিয়ার কাছ থেকে কতখানি দূরত্বে বসবে সেটাই বুঝতে পারল না।
ডালিয়া নিজেই একটা চেয়ার তার সামনে টেনে দিয়ে বলল, বসুন, এখানটায় বসুন।
মুখোমুখি চেয়ারে বসে অরিন্দম রীতিমতন নার্ভাস বোধ করল। এ যে অসহ্য সুন্দর—এর দিকে তাকালেও বুকের মধ্যে এক ধরনের কষ্ট হয়। অরিন্দম ঈশ্বর মানে না। যদি মানত, তাহলে এখন ভাবতে পারত, ঈশ্বর অত্যন্ত পক্ষপাতিত্ব করে এরকম দু'একটি মেয়ে সৃষ্টি করেন। শরীরে কোথাও কোন খুঁত নেই। এই হচ্ছে মূর্তিমতী যৌবন।

ঐ চোখ ও ভুরুর রেখা, পাতলা দুটি ঠোট, মসৃণ চিবুক, বুকের ডৌল ও সরু কোমর—চওড়া উরুদ্বয়—কবির কল্পনায় এরকম নারীর বর্ণনা করেছে, শিল্পীরা কল্পনায় এঁকেছে—কিন্তু সত্যি সত্যি চোখেও দেখা যে যায়—অরিন্দম কখনো ভাবেনি।

ডালিয়া চেয়ারে হেলান দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় বসেছে, একটা পা সামনে এগনো, প্রায় অরিন্দমের চেয়ারের কাছে। আস্তে আস্তে নাড়ছে পা-টা। অরিন্দমের দৃষ্টি সেদিকে নিবদ্ধ। হঠাৎ তার মনে হল, মাটিতে বসে পড়ে পা-টা ছুঁয়ে দেখে। এই নারীর শরীরের কোন অংশ একটু ছুঁয়ে না দেখলে তার জীবনটাই যেন ব্যর্থ হয়ে যাবে। সেই দুর্দান্ত ইচ্ছেটা তার ভেতরে ছটফট করছে।

আরে, শেষ পর্যন্ত কি অরিন্দম পাগল হয়ে যাবে নাকি? এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। সে একটা সামান্য গরীরের ছেলে, কোথাও কেউ পাত্তা দেয় না—আজ সে এখানে এই সুন্দরীশ্রেষ্ঠার মুখোমুখি বসেছে—এমন সৌভাগ্যের কথা সে কখনো ভাবতে পেরেছিল! ঘরে আর কেউ নেই!

দু'এক মিনিট কেউ কোন কথা বলল না। অরিন্দম যদিও মনে মনে অনেক কথা বলছে। ডালিয়া সোজা তাকিয়ে আছে অরিন্দমের চোখের দিকে। কিন্তু অরিন্দম ঠিক চোখে চোখে রাখতে পারছে না। একবার চোখাচোখি হতেই আবার সরিয়ে নিচ্ছে। কি পাতলা ঠোঁট ডালিয়ার। সত্যিই গোলাপের পাপড়ির মতন। মানষের হাতের আঙুল যে সত্যিই চাঁপা ফুলের মতন হতে পারে, তা ডালিয়াকে না দেখলে বিশ্বাস করা যেত না!

ডালিয়া বুঝতে পেরেছিল যে অরিন্দম তাকে মুগ্ধ হয়ে দেখছে। সেটা উপভোগই করছিল ডালিয়া। একটু বাদে স্তব্ধতা ভেঙে বলল, বলুন? অরিন্দম ডালিয়ার চোখে চোখ রেখে একটু হেসে বলল, কি বলব বুঝতে পারছি না।

—প্রশ্ন-টশ্নগুলো ঠিক করে আসেননি?

—না তো! কিছুই ঠিক করে আসিনি।

—তাহলে কী কী জানার আছে বলুন? জীবনী টিবনীগুলো অনেক-বার বেরিয়েছে, ও আর বলার কোন মানে হয় না! আচ্ছা, আপনাদের কাগজের লেটেস্ট সংখ্যাটা বেরিয়েছে? পাইনি তো এখনো?

—কোন্ কাগজ?
—আপনাদের কাগজ।
অরিন্দম একটু অবাক হয়ে বলল, আমি তো কোন কাগজ থেকে আসিনি! তৎক্ষণাৎ ডালিয়ার ভুরু কুঁচকে গেল। বিরক্তভাবে জিজ্ঞেস করল, কাগজ থেকে আসেননি তো, কোথা থেকে এসেছেন? একটা সিনেমা পত্রিকা থেকে ইণ্টারভিউ নিতে আসবার কথা ছিল তো এই সময়—
অরিন্দম আহতভাবে বলল, আমাকে চিনতে পারছেন না? আমার নাম অরিন্দম লাহিড়ী।
—হ্যাঁ, মুখটা চেনা-চেনা লাগছে। আমি ভেবেছিলাম আপনি মাসিক সিনেমার লোক।
—না, আমি সেখান থেকে আসেনি। গত সপ্তাহে···চন্দননগরে···আমার মামার বাড়িতে···আপনাদের শুটিং নষ্ট হয়ে গেল—
ডালিয়ার ভুরু এবার সোজা হয়ে গেল, মুখে হাসি ফুটল। তারপর বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঠিক। চন্দননগরে দেখা হয়েছিল, না? তাই মুখটা চেনা-চেনা লাগছে। ব্যাপার কি জানেন, এত লোকের সঙ্গে মিশতে হয় —এত লোকের সঙ্গে পরিচয় হয় যে, সকলের নাম আর চেহারা মনে রাখতে গেলে মাথার ভিতরটা চিড়িয়াখানা হয়ে যাবে।
অরিন্দম চুপ করে বসে রইল। ঈশ্বর ওকে রূপ-যৌবন অকৃপণ ভাবে দিয়েছেন বলেই হয়তো বুদ্ধি আর স্মৃতিশক্তি যথেষ্ট পরিমাণে দিতে ভুলে গেছেন। ঈশ্বর কিংবা প্রকৃতি, যাই হোক।
ডালিয়া সহজ হবার চেষ্টা করে বলল, তারপর কী খবর বলুন?
—অরিন্দম বলল, না, খবর কিছু নেই এমনিই এলাম। আপনি বলেছিলেন।
—বাঃ। খুব খুশী হলাম। আমার বড্ড কাজ, জানেন। দেখুন না, নাচের শট্‌টা আবার রি-টেক হবে। সাউণ্ড খারাপ হয়েছে। এত কষ্ট করে নাচলুম!
—আপনি একটুবাদে আবার নাচবেন? আমি সে-সময় থাকতে পারি? একটু দেখতাম—
—একেবারে ফিল্মে দেখবেন। আমি ফ্লোরে কারুকে থাকতে দিই না।
—সামনাসামনি খুব দেখার ইচ্ছে ছিল। কখনো শুটিং দেখিনি—
—রিকোয়েস্ট করবেন না। আমি দুঃখিত। ফ্লোরে আমি কক্ষনো

বাইরের লোককে থাকতে দিই না।
---আচ্ছা ঠিক আছে। আমি কি আপনাকে ডিসটার্ব করছি?
---না না। মাসিক সিনেমা-কাগজ থেকে একজনের আসবার কথা ছিল
—টেলিফোনে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করেছে—
তারপর গলা জড়িয়ে ডালিয়া বলল, বিকু, এক গেলাস জল পাঠিয়ে দাও না। আপনি জল খাবেন?
—না।
বিকু এসে জল দিয়ে গেল, একটু অবাক হয়ে দেখে গেল অরিন্দমকে। অরিন্দম তাকে দেখেনি। সে একদৃষ্টে শুধু ডালিয়ার দিকেই তাকিয়ে আছে। মনের মধ্যে খানিকটা নৈরাশ্য, চোখে তৃষ্ণা।
জল খাবার সময় সবারই দাঁত দেখা যায় কাঁচের গেলাসে, কিন্তু ডালিয়া এমন ভাবে এসব রপ্ত করেছে যে, তার বিসদৃশ কিছুই চোখে পড়বে না। অরিন্দমের খুব ইচ্ছে করছে আরও কিছুক্ষণ বসে থাকতে। অথচ, ডালিয়া বোধহয় চায়, এবার সে উঠে যাক। অরিন্দমের পকেটে খচ খচ করছে তার চারটে নতুন লেখা কবিতা—অনেক যত্নে কপি করা! একটা কবিতা প্রায় বলতে গেলে ডালিয়াকে নিয়েই লেখা। কিন্তু ডালিয়া তো সে ব্যাপারে কোন উচ্চবাচ্যই করল না। অরিন্দম একটু হেসে জিজ্ঞেস করল, আমার সম্পর্কে কিছুই বোধহয় আপনার মনে নেই? আমি একজন কবি।
—ও, আচ্ছা। কবি, মানে কবিতা লেখেন?
—হ্যাঁ।
ডালিয়া আবার উদাসীন। সেদিন অত কথা হল সে সব কি ভুলে যাওয়া সম্ভব? জড়ভরত হলে আলাদা কথা ছিল, কিন্তু অন্য সর্বদিকে ডালিয়াকে তো বেশ বুদ্ধিমতীই মনে হয়। শুধু তার স্মৃতির জায়গাটা ব্ল্যাঙ্ক, এ কি হতে পারে? কিংবা ইচ্ছে করেই এরকম করছে? নিপুণ অভিনয়! মানুষকে চিনতে না পারা মানে তার প্রতি অবজ্ঞা দেখানো—বোকারা এই এক ধরনের অহঙ্কার দেখায়।
ডালিয়া আলগা ভাবে জিজ্ঞেস করল, আপনি কোন ছবিতে গান-টান লিখেছেন?
আবার সেই প্রশ্ন। এই কথাটা শুনলেই অরিন্দমের গা জ্বলে যায়। কবিতা লেখা আর বাংলা সিনেমার ন্যাকা ন্যাকা গান লেখা কি এক?

অরিন্দম একটু বাঁকা ভাবে বলল, সিনেমার গান ছাড়া আর কোন কবিতা বুঝি আপনি পড়েন না ?
ডালিয়া ত্রস্তভঙ্গিতে বলল, রক্ষে করুন। ওসব কবিতা-টবিতা পড়ার ধৈর্য আমার নেই। একেই তো বলতে গেলে মরার সময় পাই না—
তারপর ডালিয়া উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আচ্ছা!
অরিন্দম উঠে দাঁড়াল। ডালিয়া এখন তাকে চলে যেতে বলছে। কিন্তু ওর সঙ্গে ঠিক মতন একটাও কথা হল না। মেয়েটা কি ওকে অপমান করার জন্যই ডেকেছিল! এই শেষ। ডালিয়ার সঙ্গে আর দেখা হবে না। হঠাৎ একটা স্বপ্নের মতন তার জীবনে ডালিয়ার পর্বটা ঘটে গেল। অরিন্দমের মোহ কেটে গেছে। সে আর ব্যস্ত হবে না—এদের সঙ্গে কথা বলার জন্য। ডালিয়ারা অন্য জগতের, সেখানে তার স্থান নেই।
ডালিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অরিন্দম আস্তে আস্তে হাঁটছে। কবিতা-গুলো শোনানো হল না। আর হবেও না কোনদিন। এইসব মেয়েরা বোঝে না কেন, এরা একটু প্রশ্রয় দিলে কবিরা কত প্রেরণা পায়। প্রাচীন-কালে বাছা বাছা সুন্দরী মেয়েদের রাজার হুকুমে নাচ-গান শিখিয়ে নর্তকী এবং বারনারী করা হতো। যাতে তারা শুধু একজনের ভোগে না লেগে সকলের হতে পারে। কবি, শিল্পী, গায়করাও মেশার সুযোগ পায় তাদের সঙ্গে। আজকাল, টাকা না থাকলে—
সেই লম্বা লোকটা একটু দূরে দাঁড়িয়ে। অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, এরই মধ্যে হয়ে গেল, স্যর? আপনাদের ক্যামেরাম্যান এল না? স্টিল ছবির যদি দরকার থাকে—
পেছন থেকে কে যেন ডাকল, এই যে, একটু শুনুন।
অরিন্দম ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, বিকু নামের সেই লোকটি আসছে তার দিকে। অরিন্দম থমকে দাঁড়াল। ডালিয়া কি তাকে আবার ডাকতে পাঠিয়েছে?
বিকু এসে অবলীলাক্রমে তার ঘাড়ে হাত রেখে বলল, আপনাকে ভাই আমি বিনা পয়সায় একটা অ্যাডভাইস দেবো? মিসেস সোমের কাছে ওরকম আর ঘুরঘুর করবেন না।
অরিন্দম অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, মিসেস সোম কে?
—যার কাছে আপনি গিয়েছিলেন।
ডালিয়ার যে বিয়ে হয়ে গেছে এবং তার পদবী যে সোম—এসব কিছুই

জানত না অরিন্দম। যাই হোক, সে কাঁধ থেকে বিকুর হাতটা সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে বলল, আপনি হাত সরান।
বিকুর হাত শক্ত হয়ে বসেছে। সেই লম্বা লোকটি এই সময় এগিয়ে এসে বলল, এই বিকুদা, ইনি টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়ার রিপোর্টার।
বিকু হাত সরিয়ে নিয়ে বলল, রিপোর্টার? কই, প্রেস-কার্ড দেখি? আইডেনটিটি কিছু আছে?
অরিন্দম গম্ভীরভাবে বলল, আমার সে-সব কিছু লাগে না।
বিকু দু'পাটি দাঁত দেখিয়ে নিঃশব্দে হাসল। তারপর সেই লম্বা লোকটির দিকে তাকিয়ে বলল, আরে দূর দূর! টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়ার রিপোর্টার এত ফালতু হয় না। সেদিনও একটা পার্টিতে কোথা থেকে ঢুকে পড়ে মাতলামি করছিল। আজ আবার কখন এক ফাঁকে ওর ঘরে ঢুকে পড়েছে।
অরিন্দম চটে গিয়ে বলল, আপনি অভদ্রের মতন কথা বলবেন না। ডালিয়া দেবী আমাকে চেনেন কিনা জিজ্ঞেস করুন গিয়ে। এই তো এতক্ষণ কথা বলে এলাম।
—ডালিয়াই তো আমাকে বলল, ছেলেটাকে একটু কড়কে দাও।
—বাজে কথা। মিথ্যে কথা। বলতেই পারে না। চলুন আমার সঙ্গে। সেদিন চন্দননগরে আমরাই তো ওকে বাঁচিয়ে দিলুম। আমাদের বাড়িতে আশ্রয় না দিলে অত লোকের টানাটানিতে ডালিয়াকে আর খুঁজে পাওয়া যেত না।
অরিন্দমের কথার কোন গুরুত্ব না দিয়ে বিকু বলল, ওসব কথা থাক। আমি ভালভাবেই বলছি, আপনি ভদ্দরলোকের ছেলে—কেন এসবের মধ্যে মরতে আসছেন! ডালিয়াকে ধরে পার্ট বাগাবেন? এই তো টিং-টিং-এ চেহারা!
—আমি মোটেই পার্ট চাইতে আসিনি।
—তবে কি দাঁত কেলাতে এসেছ? মেয়েমানুষের সঙ্গে ফুর্তি করার শখ? অভদ্রের মতন কথা বলবেন না।
বিকু হিংস্রভাবে হাসল। বলল, অভদ্রতার কি দেখেছ, আমি ইচ্ছে করলে সত্যি অভদ্র হতে পারি। দেখবে?
অরিন্দমকে সামলাবার সুযোগ দিল না, বিকু বিরাট জোরে একটা থাপ্পড় কষালো তার গালে। অরিন্দম আর একটু হলে মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল।

সেই সময় লম্বা লোকটা তাদের মাঝখানে এসে দু'হাতে বাধা দিয়ে বলল, এই বিকুদা, কি হচ্ছে কি? ছেড়ে দাও, যেতে দাও না—
—আরে ধ্যাৎ, যত সব উটকো ঝামেলা। ভালভাবে বললে কথা শুনবে না।
অরিন্দমের রোগা পাতলা চেহারা। কোনদিন সে মারামারি করেনি, কিন্তু এতটা অপমান সহ্য করে সে কাপুরুষের মতন পালাবে? বিকুর চেহারা মাসলে ফোলানো গুন্ডার মতন। তবু অরিন্দম হঠাৎ জ্ঞানশূন্য হয়ে গেল। তেড়ে গেল বিকুর দিকে। সঙ্গে সঙ্গে বিকু একটা ঘুষি কষালো তার নাকে। তারপরই অরিন্দমের চোখে অন্ধকার।
সেই লম্বা লোকটি অরিন্দমের জামা-প্যাণ্টের ধুলো ঝেড়ে দাঁড় করাল। ততক্ষণে ছোটখাটো একটা ভিড় জমে গেছে। লম্বা লোকটি তার হাত ধরে নিয়ে গেল কাছাকাছি একটা কলের কাছে। বলল, মুখটা ধুয়ে নিন। নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে।
অরিন্দমের মনে হচ্ছে, তার এখন মরে গেলেও ক্ষতি নেই। এত লোক দেখছে তার মার খাওয়া। সবাই ভাবছে, সে একটা জোচ্চোর, বদমাস। ঝুমা যদি কখনো শোনে…
লম্বা লোকটি বলল, যেতে পারবেন? রিক্সা ডেকে দেবো? বিকুদা, তোমার এটা অন্যায়। এত জোর কেউ মারে!
—কেন আমার সঙ্গে টেটিয়াবাজি করতে এল?
ভিড়ের মধ্য থেকে একজন লোক বলল, যাকে-তাকে গেট দিয়ে ঢুকতে দেয় কেন?
অরিন্দম লম্বা লোকটিকে বলল, ঠিক আছে, ছেড়ে দিন। আমি যেতে পারব।
তারপর বিকুর দিকে ফিরে বলল, আপনাকে আমি ছাড়ব না। একদিন না একদিন দেখে নেবই।
—যাও, যাও। যা দেখবার দেখো—এখন কাটো। আমার যদি আবার রাগ হয়ে যায়—

॥ ৭ ॥

টালিগঞ্জ ট্রাম-ডিপোর কাছে দাঁড়িয়ে আছে অরিন্দম। পৃথিবীটা তার কাছে এখন অর্থহীন। এখানে আসবার সময় তার বুকের ভেতরটা কি রকম ছিল, আর এখন কি রকম! বুকের ভেতরের কথা মানুষ ভাবে না, শুধু বাইরেটাই দেখে। এখনও তার নাক দিয়ে একটু একটু রক্ত পড়ছে, মুছে নিচ্ছে রুমাল দিয়ে। রুমালটার অবস্থা যাচ্ছেতাই। কেউ অবশ্য তাকে লক্ষ্য করছে না। কারুর সময় নেই।

অরিন্দমের চোখ-মুখের চেহারা এখন শান্ত। কিন্তু ভেতরে ভেতরে একটা অসম্ভব রাগ আর অপমান তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। বিকু নামের ঐ লোকটাকে উচিত শাস্তি না দেওয়া পর্যন্ত কিছুতেই সে নিবৃত্ত হবে না। কিন্তু ঐ দশাসই জোয়ানটাকে সে কি করে শাস্তি দেবে? বন্ধুদের ডেকে এনে মার খাওয়াবে? বন্ধুদের কাছে কি বলবে অরিন্দম? ঝুমা যদি জানতে পারে···ডালিয়া কি সত্যি পাঠিয়েছিল বিকুকে? যে-ডালিয়া অত সুন্দরভাবে কথা বলল তার সঙ্গে চন্দননগরে···! অমন সুন্দর চেহারা, অথচ এমন নিষ্ঠুর হতে পারে? ফুলের মধ্যে সাপ···

পেছন থেকে একজন কেউ তার কাঁধে হাত রাখতেই অরিন্দম দারুণ চমকে গেল। তাড়াতাড়ি সরে যাবার চেষ্টা করতেই দেখল, সেই লম্বা লোকটা। এই লোকটা অবশ্য তার সঙ্গে একবারও খারাপ ব্যবহার করেনি, কিন্তু অরিন্দম এখন কিন্তু লাইনের সব্বাইকে ঘৃণা করে।

লম্বা লোকটি সহানুভূতির সঙ্গে বলল, কী ভাই, এখনো বাড়ি যাননি? কোন্‌দিকে থাকেন?

অরিন্দম রুক্ষভাবে বলল, আপনার সেটা জানার দরকার নেই। আপনি যে-দিকে যাচ্ছেন যান।

লোকটি হাসল। বলল, আপনি খুব রেগে আছেন দেখছি। কিন্তু আমি কি কোন দোষ করেছি? বিকুটা একটা গোঁয়ার।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে, সে আমি বুঝব।

লোকটি নাছোড়বান্দা। তবু অরিন্দমের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। কি যেন ভাবছে। তারপর বলল, ভাই, আপনাকে একটা অনুরোধ করব? এই কাছেই আমি থাকি। আমার বাড়িতে একটু আসবেন?

অরিন্দম অবাক হয়ে তাকাল। লোকটি খুব আন্তরিক ভাবে বলল, আসুন না! এক কাপ চা খেয়ে যাবেন?

লোকটি হাত ধরে এমন টানাটানি করতে লাগল যে, অরিন্দম আর কিছুতেই না বলতে পারল না।

লোকটির সঙ্গে অরিন্দম সবেমাত্র রাস্তা পার হতে যাচ্ছে, এমন সময় একটা গাড়ির দিকে তাকিয়ে তার বুকটা ধক করে উঠল। সাদা রঙের গাড়ি, পেছনের সীটে একা বসে আছে ডালিয়া! তার চোখে কালো চশমা, কপালের ওপর একটা হাত দিয়ে মুখটা ঢাকা। তবু অরিন্দম ঠিক চিনতে পেরেছে। ড্রাইভারের পাশে আছে বিকু। অরিন্দম অস্ফুটভাবে বলল, দেখে নেব!

লম্বা লোকটি জিজ্ঞেস করল, কি হল?

—কিছু না।

ট্রাম-ডিপো ছাড়িয়ে অনেক গলি-ঘুঁজি ঘুরে লোকটির বাড়ি। দরজায় ধাক্কা দিতেই একটি তেরো-চৌদ্দ বছরের মেয়ে এসে খুলে দিল। মেয়েটির গায়ের ফ্রকটি বেশ ছেঁড়া, অরিন্দমকে দেখেই সে দ্রুত চলে গেল ভেতরে। লম্বা লোকটি অরিন্দমকে বলল, আসুন, ভেতরে আসুন।

একটা লম্বাটে ধরনের ঘর, আলো ঢোকে না, দেয়ালে ড্যাম্পের দাগ। একপাশে একটা চৌকি পাতা, আর এক পাশে একটা টেবিল ও কয়েকটা চেয়ার। লোকটি বলল, বসুন, বসুন! একটু চায়ের কথা বলে আসি। তারপর গল্প করা যাবে।

অরিন্দম একটু ভ্যাবাচাকা হয়ে গেছে। লোকটি কেন তাকে নিয়ে এল এখানে? লোকটির নামও সে এখনো জানে না। আসবার পথে যতবারই কিছু জিজেস করেছে, লোকটি বলেছে, চলুন না, চলুন না, বাড়িতে বসে সব কথা হবে।

রীতিমতন দারিদ্র্যের চিহ্ন চারদিকে। জানলায় একটা পর্দা ঝুলছে, সে পর্দাটা যে কতকাল কাচা হয় না, তার ঠিক নেই। চৌকিটার একটা পায়া ভাঙা, সেখানে ইঁট দিয়ে রাখা হয়েছে। দেয়ালে ঝোলানো রয়েছে একটা তানপুরা, ধুলোয় ভর্তি। 'যখন জমবে ধুলো তানপুরাটার তারগুলোয়' —লাইনটা মনে পড়ে যাবেই। অরিন্দমও গরীব ঘরের ছেলে, কিন্তু তাদের বাড়িটা একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ধুলো ঝাড়তে তো পয়সা খরচ হয় না। কিন্তু দারিদ্র্য যখন মানুষের ভেতরটাকেও ঝরঝরে করে

দেয়, তখন আর এসব দিকে মন থাকে না।

লোকটি ফিরে এসে চৌকিটায় বসল। বিছানার তলায় হাত ঢুকিয়ে একটা চ্যাপ্টা টিনের কৌটো খুঁজে এনে তার ভেতর থেকে একটা বিড়ি বার করল। লোকটি কিন্তু বাইরে রাস্তায় সিগারেট খাচ্ছিল, অরিন্দম লক্ষ্য করেছে।

একটা বিড়ি অরিন্দমের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে লোকটি জিজ্ঞেস করল—খাবেন?

অরিন্দম কখনো বিড়ি খায়নি। কিন্তু এসব জায়গায় আপত্তি করা যায় না। হাত বাড়িয়ে নিয়ে ধরাল বিড়িটা। লোকটি বলল, আমার নাম অনুতোষ চক্রবর্তী। আপনার?

অরিন্দমের নাম শোনার পর অনুতোষ বলল, আমি আপনার থেকে অন্তত বছর দশেকের বড়ই হব। আপনি না বলে যদি তুমি বলি, কোন আপত্তি আছে ভাই? তুমিও আমাকে তুমি বলতে পার।

অরিন্দম হাসি-হাসি মুখ করে চুপ করে রইল।

অনুতোষ বলল, তোমাকে দেখেই আমি কেন অ্যাট্রাকটেড হয়েছিলুম জানো? আমার নিজের কথা মনে পড়ছিল। ঠিক তোমারই মতন বয়সে আমিও এই লাইনের মোহে পড়েছিলুম। একজন চেনা লোককে ধরে ঢুকেছিলুম স্টুডিওর ভেতরে। তারপর এই বারো বছরে বুঝেছি, এ লাইনটা কি সাঙ্ঘাতিক লাইন।

—আপনি স্টুডিওতে কি কাজ করেন?

গায়ে খাটা মিস্তিরির কাজ। এটা সেটা এগিয়ে দেওয়া আর কি। ভালো বাংলায় যাকে বলে টেকনিশিয়ান, হেঃ হেঃ।

—টেকনিশয়ান? মানে, আপনি ঠিক কোন্ বিভাগের···

—আমি অনেক ঘাটের জল খেয়েছি। দু'এক সীনে অ্যাপিয়ারও হয়েছি কয়েকটা ছবিতে। এখন আমি এডিটারের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট।

এডিটার কথাটা শুনলেই অরিন্দমের পত্রিকা সম্পাদকের কথা মনে পড়ে। যে-সব সম্পাদকরা তার কবিতার নিয়তি নির্ধারণ করেন। বড় কঠিন হৃদয় তাঁদের। তারপর মনে পড়ল, সিনেমাতেও সম্পাদক থাকে—নাম দেখা যায় মাঝে মাঝে।

অরিন্দম বলল, ও, হ্যাঁ, সম্পাদক বুঝেছি। আপনাদের কাজটা কি খুব শক্ত?

অনুতোষ ভুরু কুঁচকে বলল, শক্ত? তা তো বটেই! একটা ছবির ভালো-মন্দ অনেকখানি নির্ভর করে এডিটারের ওপর। বাইরের লোক অবশ্য সে সব বোঝে না। ভালো ভালো হিট ছবির এডিটারের নাম ক'জন শুনেছে? তবে পরিচালকরা, অ্যাকটর-অ্যাকট্রেসরা খাতির করে। আমাকে করে না অবশ্য। আমি তো দু'নম্বর অ্যাসিস্ট্যান্ট। এক নম্বরও হতে পারিনি। কত মাইনে পাই, জানো? আড়াইশো টাকা। তাও সব মাসে পাই না। ছবির কাজ যখন থাকে না, তখন হরিমটর! মজাটা বুঝলে তো? বড় বড় হিরো-হিরোইনরা আমাদের চেনে, পরিচালকরা আমাদের কাঁধে হাত দিয়ে কথা বলে, কত ছেলে-মেয়ে ফিলম্ লাইনে ঢুকিয়ে দেবার জন্য আমাদের ধরাধরি করে—এদিকে আমরা সারা মাস খাবার জোটাতে পারি না। আমাদের মতন টেকনিশিয়ানদের বাদ দিলে ফিলম্ ইণ্ডাস্ট্রি অচল, অথচ আমাদের কথা কেউ ভাবে না। তাই বলছিলুম ভাই, বাইরে থেকে চকচক করে, কিন্তু এ বড় বিচ্ছিরি লাইন! এ লাইনে আসার চেষ্টা করো না।

—আমি তো ফিলম্ লাইনে ঢুকতে চাই না।

—স্টুডিও'র মধ্যে একবার পা দিয়েছ কি ফাঁদে পড়েছ। দেখলে তো আজকের ব্যাপারটা!

অরিন্দম চুপ করে রইল। তার জীবনের এখন একমাত্র উদ্দেশ্য বিকুর ওপর প্রতিশোধ নেওয়া। কিন্তু কি ভাবে নেবে? আর ডালিয়া? ডালিয়ার কি ক্ষতি করেছে সে যে, তার পেছনে গুণ্ডা লেলিয়ে দিল? নাম হলেই বা টাকা পয়সা হলেই কি সব মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়ে যায়?

শীর্ণ চেহারার একজন মহিলা চা ও কিছু জলখাবার নিয়ে ঢুকলেন। অরিন্দম জলখাবারের প্লেটটা দেখিয়ে রীতিমতন সংকুচিত হয়ে বলল, এসব আবার কেন আনলেন? আমি শুধু চা খেতাম।

অনুতোষ বলল, খাও ভাই, খেয়ে নাও। গরীবের বলে তুচ্ছ করো না। তোমাকে দেখে আমার অনেক কথা মনে হচ্ছিল। ঠিক তোমার বয়েসে আমিও এই ফাঁদে পা দিতে এসে আটকা পড়েছি। এক সময় নিজেরও কিছু টাকাকড়ি ছিল, সব গেছে! সব।

মহিলার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, এই আমার বউ, রেণু। এর এখন এই চেহারা দেখছ, এক সময় কিন্তু রেণুও ফিলমে নেমেছিল। তুমি 'স্বর্ণমৃগ' দেখেছ? বছর আষ্টেক আগে মোটামুটি হিট করেছিল।

সেই ছবিতে রেণুর বেশ বড় পার্ট ছিল। সে চেহারা দেখলে এখন আর চিনতেই পারবে না। রেণু, অ্যালবামটা নিয়ে এস না!

মহিলা বললেন, থাক। সে-সব আর দেখাতে হবে না।

অনুতোষ স্ত্রীকে বলল, জানো রেণু, আজ স্টুডিয়োর মধ্যে বিকু—ঐ যে, ডালিয়ার সঙ্গে থাকে—এই ভদ্রলোককে এমন মেরেছে—

—ওমা, মারল কেন?

—কেন আবার কি? এ একটু ডালিয়ার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল—

প্রসঙ্গটা খুব পছন্দ হল না অরিন্দমের। এরা এখন তার প্রতি করুণা দেখাক, এটাও সে চায় না। তারপর এরা যদি ব্যাপারটা নিয়ে আরও পাঁচজনের কাছে গল্প করে—তা হলে অনেক ছড়িয়ে যাবে। যদি নিখিল কিংবা শঙ্করের কানে পেঁাছোয়? ঝুমা শুনলে যা আঘাত পাবে! কেন যে অরিন্দম এল এ বাড়িতে!

রেণু ভৎর্সনার চোখে তাকাল অরিন্দমের দিকে! বলল, আপনাদের মতন ছেলেরা কি পান ঐ সব মেয়ের কাছে? শুধু তো মেক-আপের কারসাজি। হাবলুবাবু ওকে পর পর কয়েকটা ছবিতে চান্স দিয়ে জোর করিয়ে দাঁড় করিয়েছেন। পার্ট করতে জানে! ঐ রকম মেয়ে যদি সিনেমায় নাম না করে—এমনি কখনো রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেত, কেউ তাকিয়েও দেখত না, সব মেক-আপ।

শুধু মেক-আপের জন্য ডালিয়া অত সুন্দর—একথা অরিন্দম মানতে রাজী নয়। যতই ডালিয়ার ওপর রাগ হোক। সৌন্দর্য কাকে বলে তা সে চেনে।

রেণু বলল, আমিও আপনাকে বলছি ভাই কেরানীগিরি করুন, মাস্টারী করুন—সেও অনেক ভাল, এ লাইনে আসবেন না। আমরা তো হাড়ে হাড়ে বুঝেছি, কেউ পয়সা দেয় না।

অনুতোষ বলল, দু'চারজন হীরো হয়, দু'চারটে মেয়ে হীরোইন হয়। তাদের টাকা-পয়সা আর নাম-ডাক দেখেই অন্যদের চোখ ধাঁধিয়ে যায়। কিন্তু আরও কত ভালো ছেলেমেয়ে যে এ লাইনে এসে আঁস্তাকুড়ের এঁটো পাতা হয়ে যায়—সে খবর কেউ রাখে না। চোখের সামনে তো দেখলাম, কতজনের জীবন নষ্ট হল।

অরিন্দম অস্থির হয়ে উঠে বলল, আপনারা একটা জিনিস ভুল করেছেন। সিনেমা লাইনে ঢোকার একটুও ইচ্ছে নেই আমার।

—তাহলে ডালিয়ার কাছে গিয়েছিলে কেন ?

ওর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল এক জায়গায়। আমাকে দেখা করতে বলেছিল।

অনুতোষ এ কথাটা একদম উড়িয়ে দিল। অবজ্ঞার ভঙ্গিতে বলল, ওঃ, পরিচয় ? ওদের কাছে পরিচয়ের কোন মূল্য আছে ? কত জনকে কত রকম কথা বলে! ওরা যে কখন অভিনয় করে আর কখন সত্যি কথা বলে, তা-ই বুঝতে পারবে না। তোমার যদি অনেক টাকা থাকে, তুমি যদি কোন ছবি প্রোডিউস করতে চাও, তা হলে তোমাকে খাতির করবে। ওরা টাকা ছাড়া আর কিছু চেনে ? মানুষকে মানুষ বলে মূল্য দেয় ? ওদের কোন সামাজিক জীবন আছে ? একদিন পরিচয় হয়েছিল বলেই তুমি বুঝি ভাবলে, তোমাকে একেবারে খাতির করে···দেখলে তো' বিকুকে পাঠাল অকারণে তোমাকে মার খাওয়াতে—

—ডালিয়াই কি পাঠিয়েছে ?

—আলবৎ! না হলে বিকুর এত সাহস হয় ?

আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না।

রেণু জিজ্ঞেস করল, কোথায় মেরেছে ? ইস, এই তো, ঠোঁটটা ফুলে গেছে! গরম জলে তুলো ভিজিয়ে একটু সেঁক দিয়ে দেবো ?

রেণুর আন্তরিকতায় মুগ্ধ হলেও বিব্রতভাবে অরিন্দম বলল, না না, তার দরকার নেই। আমি এবাব উঠি ববং—

—আরে, বোস না, এত ব্যস্ত কেন, বোস।

রেণু একদৃষ্টে চেয়ে আছে অরিন্দমের দিকে। আস্তে আস্তে বলল, একটা কথা জিজ্ঞেস করব ? কিছু মনে করবেন না ?

—না না, বলুন না!

—আপনার বাড়িতে কে আছে ?

—মা, বাবা, দুটো ছোট বোন, এক ভাই। আমি গভর্নমেণ্ট অফিসে চাকরি করি—

—আপনি বিয়ে করেননি ?

—না।

—তাহলে ডালিয়ার কাছে এসেছিলেন কেন ? একদিন পরিচয় হয়েছিল বলেই স্টুডিওতে ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন ? কিছু আশা করে আসেননি ?

—আশা করে? ঠিক ও ভাবে বলা যায় না। তবে আমার একটা উদ্দেশ্য ছিল।

—কি? এ রকমভাবে জিজ্ঞেস করছি বলে কিছু মনে করছেন না তো? আপনার ভালোর জন্যই জানতে চাইছি। ডালিয়া বড় সাংঘাতিক মেয়ে—অনুতোষ বলল, ওর সম্পর্কে অনেক কিছু শোনা যায়। ওর কোনরকম মর‍্যালিটির বালাই নেই। ওর একটা অপদার্থ স্বামী আছে— তাকে কোন ফাংশানে দেখা যায় না। ডালিয়া নিত্য নতুন পুরুষমানুষের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। বিশেষ করে বড় লোকের লালটু মার্কা ছেলেদের ওর খুব পছন্দ। দু'এক মাস বাদে তাদের ছিবড়ে করে ছেড়ে দেয়। তোমার বাবার টাকা-পয়সা আছে?

অরিন্দম সামান্য হেসে বলল, না!

—তা হলে ওর কাছে কেন?

—ব্যাপার কি জানেন? আমি একজন কবি। মানে, আমি আধুনিক কবিতা লিখি। ডালিয়াকে আমার কবিতা শোনাতে গিয়েছিলাম।

অনুতোষ এবং রেণু দু'জনেই স্তম্ভিতভাবে বলল, কবিতা? মানে, গা—শুধু গা কথাটুকু উচ্চারণ করা মাত্রই অরিন্দম বাধা দিয়ে বলে উঠল, না, না, না, আপনারা যা ভেবেছেন, তা নয়। সিনেমার গান লেখার একটুও ইচ্ছে নেই আমার। ডালিয়াকে ধরে আমি সিনেমার জন্য গান গছাতেও আসিনি! সিনেমার গান, যাকে আপনারা লিরিক বলেন, সে বস্তু লেখার সাধ্যও আমার নেই। আমি এমনি কবিতা লিখি। সেগুলো শোনাবার জন্য—

অনুতোষ বলল, ডালিয়াকে আপনি কবিতা শোনাতে গিয়েছিলেন?

তারপর সে আর রেণু দু'জনেই হো-হো করে হেসে উঠল। হাসি আর থামতেই চায় না। হাসির শব্দ শুনে সেই ফ্রক-পরা মেয়েটি এসে একবার উঁকি দিয়ে গেল। রেণু তাকে বলল, এই টুকটুকি, ছাদ থেকে কাপড়-গুলো তুলে আনিস তো! অর্থাৎ রেণু এমন মুখরোচক গল্প ছেড়ে উঠতে চায় না।

অনুতোষ বলল, ডালিয়া কোনদিন কোন বইয়ের পাতা উল্টে দেখেছে কি না সন্দেহ! ওকে দিয়ে ডায়ালগ মুখস্থ করানোই যা ঝামেলা—

রেণু বলল, কবিরা সত্যি পাগল হয়, না? এর আগে কোন কবিকে আমি চোখের সামনে দেখিনি। চেহারা দেখে তো কিছু বোঝা যায় না।

এবার অরিন্দমের হাসবার পালা। হাসিমুখে বলল, কবিদের কি চেহারাও আলাদা হবে?

—না, ঠিক কবি কবি ভাব যাকে বলে।

অনুতোষ বলল, হঠাৎ ডালিয়াকে কবিতা শোনাবার ইচ্ছে হল কেন তোমার? তাও অপর্ণা সেনকে শোনাতে চাইলেও না হয় বুঝতাম। ওনার একটা কালচার আছে, পড়াশুনো আছে—

—আমি তো অপর্ণা সেনকে চিনি না। ডালিয়ার সঙ্গে বাইচান্স পরিচয় হয়েছে—পৃথিবীতে আমি এ পর্যন্ত যত মেয়ে দেখেছি, তার মধ্যে ডালিয়াই সবচেয়ে সুন্দরী। অবশ্য এলিজাবেথ টেলার ওর চেয়েও বেশী সুন্দরী, কিন্তু তাকে আর পাচ্ছি কোথায়! কোন সুন্দরী মেয়েকে আমার কবিতা শোনাতে খুব ইচ্ছে করে।

—কেন?

—কেন! কারণ হিসাবে বলা যায়, সৌন্দর্য হচ্ছে কবিতার প্রেরণা।

—কিন্তু ডালিয়া যে তোমার কবিতার কিছু বুঝবে না।

—না বুঝলেই বা। ডালিয়াকে আমি যেটুকু দেখেছি, তাতে বুঝতে পেরেছি, ওর শরীরটাই শুধু সুন্দর, মাথায় ব্রেন বলে কিছু নেই, হাফ-উইট বলা যায়। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না—

—তবু, ওকেই জোর করে কবিতা শোনাতে হবে?

—দেখুন, কবিরা যে সমুদ্র বা আকাশকে উদ্দেশ্য করে কবিতা লেখে—আকাশ বা সমুদ্র কি তা বোঝে? কিংবা ধরুন, একটা সুন্দর ফুল-গাছকে নিয়ে যদি কবিতা লেখা হয়—ফুলগাছ কি তার কোন প্রতিদান দেয়? ঐ যে বললাম না, সৌন্দর্য হচ্ছে কবিতার প্রেরণা।

অনুতোষ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, তুমি যা বলছ, এগুলো হচ্ছে গতানুগতিক সৌন্দর্য। সমুদ্র, আকাশ বা মেয়েদের রূপ—এ নিয়ে ঢের ঢের লেখা হয়েছে—

—তবু এগুলো পুরনো হয় না। তবু মানুষ এদের প্রেমে পড়ে এখনো।

—কিন্তু আমার মনে হয়, এখন কবিতার প্রেরণা আসা উচিত মানুষের দুঃখ-দুর্দশা কিংবা বেঁচে থাকার লড়াই থেকে। দ্যাখ, আজ সারা পৃথিবীতেই খেটে-খাওয়া মানুষ অধিকার আদায় করার জন্য রুখে দাঁড়িয়েছে—এটাই এখন সবচেয়ে বড় ঘটনা, কবিতা কিংবা সাহিত্য-টাহিত্য কি এইসব নিয়েই লেখা উচিত নয়?

তর্ক করতে উদ্যত হয়েও অরিন্দম চুপ করে গেল। সবাই আজকাল কবিতা কিংবা সাহিত্য বিষয়ে জ্ঞান দেয়। খেটে-খাওয়া মানুষদের নিয়ে কবিতা! এ কথার অনেক চোখা চোখা উত্তর আছে অরিন্দমের– কিন্তু এখন তর্কের সময় নয়। একটুক্ষণ থেমে থেকে বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আমার একটা ঝোঁক চেপে গেছে।
অনুতোষ বলল, ঐ ঝোঁকটাই তো সাঙ্ঘাতিক! আমিও তো ঝোঁকের মাথাতেই এসেছিলাম এ লাইনে। মফঃস্বলের ছেলে হাতে কিছু টাকা-কড়িও ছিল। কত লোক কতরকম লোভনীয় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল– দু' তিন মাস বাদে দেখলাম সব ভোঁ ভোঁ, টাকা-পয়সাও শেষ! তখনও কিন্তু ঝোঁক কাটেনি। তখনও যদি অন্য কোন চাকরি-বাকরি খুঁজে নিতাম— তা হলে জীবন অন্যরকম হতো। পারিনি। এ লাইনের লোকের পায়ে পায়ে ঘুরেছি। শেষ পর্যন্ত এই অবস্থা!
রেণু বলল, আমার মেয়ে টুকটুকিও কবিতা লেখে। ও এবার ক্লাস টেনে উঠেছে, বেশ লেখে কিন্তু। আপনি ওর কবিতাগুলো একটু দেখে দেবেন?
অরিন্দম চঞ্চল হয়ে উঠল। এসব সে একদম পছন্দ করে না। অনেক বাবা-মা ছেলেমেয়ের গুণপনা নিয়ে আদিখ্যেতা করেন, তাতে অংশগ্রহণ করা একটা অস্বস্তিকর ব্যাপার।
অরিন্দম তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আজকে আমাকে এবার যেতেই হবে। আর একদিন না হয়—
অনুতোষ বলল, আরে ভাই বসোই না! অত তাড়া কিসের!
—না, আমার একটা কাজ আছে!
—ডালিয়ার সঙ্গে আর দেখা করার চেষ্টা করবে না?
অরিন্দম দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে উত্তর দিল, ভেবে দেখি!
রেণু বলল, আর একদিন ঠিক আসবেন তো?
অনুতোষ রাস্তার মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে বলল, তোমার যখন ডালিয়াকে দেখার এতই ঝোঁক, তোমাকে আমি একদিন তাহলে ওর বাড়িতে নিয়ে যেতে পারি। শুধু আমার সঙ্গে অবশ্য পাত্তা পাবে না। ডলুদাকে নিয়ে যাব। ডলুদা ওর পরের দুটো ছবির ক্যামেরাম্যান। সব হীরোয়িনরাই ক্যামেরাম্যানদের খাতির করে।
অরিন্দম বলল, না, থাক, তার দরকার নেই।
—কেন, চল না একদিন। আমি কথা দিচ্ছি, এবার আর তোমাকে কেউ

কিছু বলবে না।
—না, আমি আর যেতে চাই না। আপনি শুধু ওর টেলিফোন নম্বরটা আমাকে যোগাড় করে দিতে পারবেন?
অনুতোষ বলল, সেটা আর এমন শক্ত কি! তুমি ভাই আমার বাড়িতে এসো কিন্তু আবার। গরীবকে মনে থাকবে তো? আমরাও যেন মাঝে মাঝে একটু কবিতা শোনার চান্স পাই! আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, আমার বউও তেমন সুন্দরী নয়—তবু আমাদেরও তো কবিতা শোনার ইচ্ছে হতে পারে? কবিরা কি আমাদের পাত্তা দেবে না?
উত্তর না দিয়ে অরিন্দম লাজুক ভাবে হাসল।

॥ ৮ ॥

—আমি শুধু একটা কথা জানতে চাই, আপনি বিকুকে পাঠিয়েছিলেন আমাকে মারবার জন্য?
—আমি? অসম্ভব! তুমি এটা বিশ্বাস করতে পারলে? আমি কখনো এরকম পারি?
—নিশ্চয়ই পারেন! আপনি ছাড়া আর কে পাঠাবে?
—বিশ্বাস কর, অরিন্দম, তোমাকে কতবার বলব, এ রকম কাজ আমি কক্ষনো করতে পারি না—
—আপনাকে আমি আমাকে 'তুমি' বলে ডাকবার কোন অধিকার দিইনি। আপনি সিনেমা-স্টার হতে পারেন, কিন্তু আমিও একজন কবি। আমার একটা প্রেস্টিজ আছে। প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব সম্মান আছে।
—আমার ভুল হয়েছে কিন্তু সেদিন থেকে আমি মনে মনে এতবার আপনার কথা ভাবছি—আমার জন্য আপনি মার খেয়েছেন, ছিঃ, ছিঃ, ভাবতেও পারছি না আমি—যখন প্রথম শুনলাম, আমার এমন কষ্ট হল —আমি কেঁদেছিলাম পর্যন্ত। আপনি বিশ্বাস করুন, আপনার কথা ভেবে আমি কেঁদেছিলাম।
—আপনাকে এখন নাটক করতে হবে না। আমি টেলিফোনে নাটক শুনতে চাই না। আমি সত্যি কথাটা জানতে চাই।

—আমি তো সত্যি কথাই বলছি! তবু বিশ্বাস করছেন না?
—না, আমি বিশ্বাস করি না। আপনার কোন কিছুই আমি বিশ্বাস করি না। আপনি না পাঠালে বিকুর কি এত সাহস হয়।
বিকুকে আমি ওকথা বলিনি, বলিনি, বলিনি! আরও কতবার বলব! সেদিন ঐ কথা শোনার পর বিকুকে আমি ছাড়িয়ে দিয়েছি। আপনি আমার চিঠি পাননি?
—কিসের চিঠি?
আপনাকে তার পর থেকে কত যে খুঁজেছি, আপনি জানেন না! কতজনকে জিজ্ঞেস করেছি, কবি অরিন্দম লাহিড়ীর ঠিকানা জানে কি না? কেউ বলতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত মনে পড়ল, চন্দননগরে আপনার মামার বাড়ি। সেখানে পাঠিয়েছি চিঠি। আপনি পাননি?
—এসব আপনার বানানো কথা। আপনি মোটেই চিঠি লেখেননি। আপনি চিঠি লিখতে জানেন কিনা আমার সন্দেহ হয়!
—ভালো পারি না। কোনরকমে লিখেছি। আপনি সে চিঠি পাননি বলতে চান?
—না।
—সেই চিঠিতে তোমাকে, মানে আপনাকে আর একবার আসতে বলেছিলাম। অপরাধের কি প্রায়শ্চিত্ত হয় না?
—আমি আপনার সঙ্গে আবার দেখা করতে যাব?
—একবারটি। প্লিজ!
—একথা বলতে আপনার লজ্জা হয় না? আপনি আবার আমাকে অপমান করতে চান?
—না, আমি ক্ষমা চাইতে চাই।
—আমি মরে গেলেও আর আপনার সঙ্গে দেখা করব না।
—আমি কি এতই ঘৃণ্য যে আমাকে ক্ষমা করাও যায় না? সিনেমায় অভিনয় করি বলে কি মানুষ হিসেবে কেউ আমাকে ক্ষমা করবে না?
—আর কেউ ক্ষমা করতে পারবে কি না জানি না, আমি অন্তত পারব না! আমি আপনার কোন ক্ষতি করিনি—তবু আপনি আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে অপমান করেছেন। শুধু তাই নয়, আপনার পোষা গুণ্ডা দিয়ে মার খাইয়েছেন।
—তার বদলে আপনি যদি এসে আমাকে কয়েক ঘা মেরে যান, তা হলে

কি আমি ক্ষমা পাব ? কবিরা কি মানুষকে কখনো ক্ষমা করে না ?
অরিন্দম টেলিফোনটা ধরে একটুক্ষণ চুপ করে রইল। কি রকম সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলছে! সব অভিনয়! উঃ, এরা একটুও স্বাভাবিক ভাবে কথা বলতে পারে না।
একটু নরম হয়ে আসছিল অরিন্দমের মন। আবার কঠিন করে নিল ওদিক থেকে ডালিয়া বলছে, হ্যালো, হ্যালো, লাইন ছেড়ে দিয়েছেন ? হ্যালো—
অরিন্দম বলল, আপনি সুন্দরী হতে পারেন, সিনেমা করে অনেক টাকা পেতে পারেন—তা বলে কি যা খুশী তাই করবেন ? অকারণে যার তার ওপর গুন্ডা লেলিয়ে দেবেন ? সমাজ এসব সহ্য করবে, না ?
ডালিয়া বলল, আমার সত্যি অনেক দোষ আছে।
বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল। মনে হল যেন ডালিয়া কেঁদে ফেলেছে। অরিন্দম ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল। সিনেমার মেয়ে ওরা, যখন তখন কাঁদতে পারে। আসল কান্না ওরা ভুলে গেছে।
অরিন্দম বলল, দেখুন, কেউ আমাকে অপমান করলে আমি তার প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়ি না। বিকুকে আমি দেখে নেব। আমি শুধু আপনার কাছে জানতে চাই, আপনার আমি কী ক্ষতি করেছিলাম যে, বিকুকে আপনি ঐ রকম ভাবে পাঠালেন—
—আমি যদি বিকুকে পাঠিয়ে থাকি, তা হলে আমার জিভ খসে পড়ুক। প্লিজ, আপনি একদিন আসুন আমার কাছে, আমি হাতজোড় করে ক্ষমা চাইব। আসবেন ?
—আপনার লজ্জা করে না, আপনি আবার আমাকে যেতে বলছেন!
—আপনি যদি না আসেন, সারা জীবন আমার মনে এই নিয়ে একটা দুঃখ থাকবে! আমার আর যত দোষই থাকুক, কারুকে আমি মার খাওয়াব—একথা আমার শত্রুরাও বলবে না। একবার অন্তত আসুন!
—না। আমার পক্ষে সম্ভব নয়।
—আমি আপনাকে গাড়ি পাঠিয়ে দেবো। শুধু একবারটি পাঁচ মিনিটের জন্য আসবেন!
—আমি গাড়ি-ফাড়ি গ্রাহ্য করি না। যাব না বলছি, ব্যস, যাব না!
—তা হলে আপনার বাড়ির ঠিকানা বলুন, আমিই সেখানে যাব। বাড়ির সামনে ভিড় জমে গেলে কিন্তু আমি দায়ী নই—জানেন তো,

আমাদের কোথাও যাওয়া-আসার স্বাধীনতা নেই—
—আমার বাড়িতে তো আপনার কোন দরকার নেই। আপনি যদি ভেবে থাকেন, আমার বাড়িতে এসে আমাকে ধন্য করে দেবেন, তাহলে খুব ভুল ভেবেছেন!
—আমি নিজেই যদি ধন্য হই?
—ন্যাকামি করবেন না! আপনাকে আমার ঢের চেনা হয়ে গেছে!
—আর একবার চেনার সুযোগ দেবেন না?
—না!
—আপনি যদি একবার অন্তত না আসেন, তা হলে বুঝব, আপনি আমাকে ক্ষমা করেননি। আমি প্রত্যেকদিন অপেক্ষা করব আপনার জন্য।
—আমি কোনদিনই যাব না।
অরিন্দম কট্ করে টেলিফোন ছেড়ে দিল। একটা ডাক্তারখানা থেকে টেলিফোন করছিল সে, কম্পাউণ্ডার অনেকক্ষণ ধরেই বিরক্ত ভাবে তাকাচ্ছিল তার দিকে।
ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে অরিন্দম রাস্তা দিয়ে এলোমেলো ভাবে হাঁটতে লাগল। মাথার মধ্যে সব কিছুই যেন ঘোলাটে হয়ে গেছে। গত ক'দিন ধরে সে প্রতিশোধ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছে না। কবিতা লেখা-টেখাও বন্ধ। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কিংবা কারুর সঙ্গেই আর দেখা করতে ইচ্ছে করে না। সেইদিনকার সেই অপমান তাকে বিষম একা করে দিয়েছে।

॥ ৯ ॥

অরিন্দম আজকাল সকালবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, ফেরে অনেক রাত্রে। দুপুরে অনেকদিন খেতেও আসে না, রাত্তিরেও তার জন্য ঢেকে রাখা ভাত ফেলা যায়। এর আগেও অরিন্দম বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে কিংবা কোন কবি-সম্মেলনে হৈ-চৈ করে বাড়ি ফিরেছে বেশী রাতে, কিন্তু পর পর টানা এতদিন এত বেশী রাত করেনি। অফিসেও সে আজ কাল প্রায়ই যায় না—কিন্তু সে-কথা বাড়ির কেউ জানে না।

অরিন্দমের মা একদিন বললেন, হ্যাঁ রে রুণু, তুই আজকাল এত রাত করে কোথা থেকে ফিরিস রে?
অরিন্দম অবাক হয়ে বলল, কই, বেশী রাত করি না তো! সাড়ে দশটার মধ্যেই ফিরে আসি।
অরিন্দম থাকে একতলার ঘরে, বাড়ির অন্য সবাই দোতলায়। দশটার মধ্যে বাড়ির সকলের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে, অরিন্দম যদি তখনও না ফেরে, তার ভাত ঢাকা দেওয়া থাকে। অরিন্দম ফিরেএসে যখন সদর দরজা বন্ধ করে, তখন সারা বাড়ি ঘুমন্ত। শুধু অরিন্দমের মা দাঁড়িয়ে থাকেন ওপরের বারান্দায়, ছেলে বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত তিনি শুতে যান না। সুতরাং অরিন্দম কখন বাড়ি ফেরে না ফেরে, তিনি ভালই জানেন।
মা জিজ্ঞেস করলেন, এত রাত পর্যন্ত কোথায় থাকিস? ভয় ডরও নেই তোর? আজকাল যা দিনকাল—
একটা খুব জরুরী কাজ করছি। সন্ধ্যের পর রোজ ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে থাকি।
—ন্যাশনাল লাইব্রেরী কতক্ষণ খোলা থাকে? অত রাত পর্যন্ত?
—না, ন্যাশনাল লাইব্রেরী বন্ধ হয়ে গেলে রোজ প্রেমেনদার বাড়িতে যাই। একটা কাব্য-নাটক লিখছি, ওঁকে রোজ শোনাই একটু একটু করে। ওঁর তো রাত্তিরে ছাড়া সময় হয় না—
—প্রেমেনদা কে?
—প্রেমেন্দ্র মিত্র! তুমি নাম শোননি! উনি আমাকে খুব স্নেহ করেন। রোজ একটু একটু লিখি, আর ওঁকে পড়িয়ে আসি।
—অত রাত পর্যন্ত ওনাকে জ্বালাতন করিস? উনি ভদ্রতা করে কিছু বলতে পারেন না—
—না না, প্রেমেনদা আমাকে খুব ভালবাসেন!
—ওসব কাব্য-টাব্য লিখে আর কি হবে। অনেক তো লিখলি, এবার—
অরিন্দম হাসতে হাসতে বলল, বাঃ, তুমি এই কথা বলছ মা? গত সপ্তাহে 'দেশ' থেকে কুড়ি টাকা পেলাম না? কবিতা লিখেও টাকা পাওয়া যায়।
—ভারী তো কুড়ি টাকা! সারা বছরে একবার না দু'বার—
—আস্তে আস্তে হবে। তুমি এখন বলছ কি হবে কবিতা লিখে? এদিকে যে তুমিই পাশের বাড়ির মাসীমাকে ডেকে গর্ব করে বলেছিলে, 'দেশ'-এ আমাদের রুণুর কবিতা বেরিয়েছে, দেখেছেন? আমি শুনিনি বুঝি?

মা একটু লজ্জা পেয়ে হাসলেন। তারপর বললেন, পাশের বাড়ির মিন্টুর মা কি রকম যেন! বিশ্বাস করতে চায় না। বলে কি, অরিন্দম লাহিড়ী নাম অনেকের হতে পারে! আমি নিজে বলছি, তাতেও বিশ্বাস নেই—

—সেদিক থেকে মা তোমাকে আমার থ্যাঙ্কস্ জানানো উচিত। নামটা আমার ভালই রেখেছিলে। কবিদের মধ্যে অরিন্দম নামের ডুপ্লিকেট নেই।

—শোন, তোর বাবা বলছিলেন, তুই ডব্লু. বি. সি. এস-টা দিলি না। এরপর বয়েস পেরিয়ে যাবে—

—ডব্লু. বি. সি. এস দিয়ে কি হাতি-ঘোড়া হবে? আজকাল ও পরীক্ষায় পাস করেও অনেকে চাকরি পায় না। শুধু শুধু পণ্ডশ্রম।

—তা বলে, সারা জীবন ঐ ছোট চাকরি করবি!

—মন্দ নয়। কত ভাল ভাল ছেলে আজকাল বেকার। আমি যে তবু কিছু একটা চাকরি করি, তাই যথেষ্ট নয়?

—সবাই জীবনে উন্নতির চেষ্টা করে। কবিতা লিখে টো-টো করে ঘুরে বেড়ালে তো সারাজীবন চলবে না। চেহারাই বা কি হচ্ছে! চোখের কোলে কালি, খাওয়া-দাওয়া করিস না ঠিক মতন!

—আমার চেহারা খারাপ হচ্ছে? তুমিই শুধু এই কথা বলো। এদিকে বন্ধুরা বলে, আমি দিন দিন মোটা হচ্ছি—

—মোটা হচ্ছিস? কোন বন্ধু বলে এ কথা? তাদের চোখের চামড়া নেই?

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। তোমাকে রাগ করতে হবে না। মায়েদের চোখ আর বন্ধুদের চোখ এক রকম হয় না।

—তোকে একটা মেয়ে খুঁজতে এসেছিল কালকে।

অরিন্দম একটু থতমত খেয়ে গেল। মায়ের মনোভাব বোঝার চেষ্টা করে নির্লিপ্ত ভাব দেখিয়ে বলল, মেয়ে? আমাকে খুঁজতে কে আসবে?

—কি যেন নাম করলে, রুমা না ঝুমা, ঠিক বুঝতে পারলাম না। নিখিলের বোন—

—ও, নিখিলের বোন? তাই বলো—? নিখিল বলছিল বটে, ওর এক বোন কবিতা-টবিতা লেখে। যদি আমি কোথাও ছাপিয়ে-টাপিয়ে দিই। ওসব ঝামেলা আমি নিতে চাই না। দেখা না হয়ে ভালোই হয়েছে।

—মেয়েটি বলছিল, তোকে অফিসে কয়েকবার টেলিফোন করেও পায়নি।
অরিন্দম হাসতে হাসতে বলল, আমাদের অফিসের টেলিফোন অপারেটার একজন পুরুষ তো। বাইরে থেকে মেয়েদের কল এলে কিছুতেই লাইন দিতে চায় না! হিংসে করে! এ ক্ষেত্রে অবশ্য আমার উপকারই করেছে। ঐ মেয়েটা বড্ড জ্বালাতন করে। কবিতা একদম লিখতে পারে না। বন্ধুর বোন, সামনাসামনি কিছু বলতেও পারি না!
মা-ও হাসলেন। ছেলেরা যে মায়েদের কিছুতেই ঠকাতে পারে না—এ কথা ছেলেরা কেন যে বোঝে না—এই ধরনের হাসি। তারপর বললেন, তোর বাবাকে কি বলব? ডব্লু. বি. সি. এস পরীক্ষা দিবি না তা হলে?
—নাঃ! ও-সব ঝামেলা আমার পোষাবে না।
হ্যাঁ রে, পরশুদিন রাত্রে যে একটা দামী গাড়ি এসে তোকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে গেল, ওটা কার গাড়ী?
— গাড়ি? ও, ওটা তো শঙ্করের গাড়ি। নতুন কিনেছে। তুমি চেনো না শঙ্করকে?
—আজ রাত্তিরে এসে ভাত খাবি কিন্তু। রোজ রোজ ভাত ফেলা যায়—

সাদার্ন এভিনিউ দিয়ে হন হন করে হেঁটে যাচ্ছিল অরিন্দম। খুব ব্যস্ত ভঙ্গি। কোন কারণে সে এত বেশী আচ্ছন্ন হয়ে আছে যে, রাস্তার দিকে খেয়াল নেই।
একটা গাড়ি হুস করে তার পাশে এসে থামল। তার থেকে মুখ বার করে শঙ্কর বলল, এই স্টুপিড!
অরিন্দম চমকে তাকাল। তারপর বলল, কি রে?
—আয়, ওঠ্। গাড়িতে উঠে পড়।
—গাড়িতে উঠব? তুই কোন্ দিকে যাবি?
—যেদিকেই যাই না। উঠে পড়।
—না রে, আমার একটা বিশেষ কাজ আছে।
—বেশী কাজ দেখাসনি! খুব কাজের লোক হয়েছিস বুঝি আজকাল? কবিরাও কাজের লোক হয় তা হলে?
—না, হয় না। কবিদের বুঝি খেতে হয় না?
—খেতে হয় নাকি? আমি তো ভেবেছিলুম, বসন্তের মৃদু-মন্দ হাওয়া খেলেই কবিদের পেট ভরে যায়। নে নে, ওঠ্। বেশী বাকতাল্লা।

মারিসনি।
অরিন্দম গাড়িতে উঠে পড়ে বলল, সত্যি বল না, কোন্ দিকে যাবি?
শঙ্কর সিগারেট বার করে বলল, কোথ্থাও যাব না। কাছেই একটা গ্যারাজে গাড়িটা সারাতে দেবো।
—কি হোল তোর গাড়িতে?
—সেলফ্ নিচ্ছে না। পুরনো ঝরঝরিয়া গাড়ি, রোজ একটা না একটা লেগেই আছে।
—এবার এটা বেচে দিয়ে একটা নতুন গাড়ি কিনে ফ্যাল।
—টাকাটা তুই দিবি? দে বাইশ হাজার টাকা।
—কেন, তোর বাবা তো বড়লোক।
—হ্যাঁ ভাই, আমি, বড়লোক বাবার গরীব ছেলে। বাবার কাছ থেকে একটাও পয়সা নিই না। শোন, গাড়িটা সারাতে ঘণ্টা দুয়েক লাগবে, তোর সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হল। আমাকে একলা দাঁড়িয়ে থাকতে হতো—চল, লেকে বসে আড্ডা দেবো।
অরিন্দম সন্ত্রস্ত হয়ে বলল, আমার সত্যিই একটা জরুরী কাজ আছে রে। এক জায়গায় যেতে হবে—
—খুব আজকাল কাজ দেখাচ্ছিস, ব্যাপারটা কি? সন্ধ্যের পর তোর কি কাজ থাকে? আজকাল তোর পাত্তাই পাওয়া যায় না। নিখিল, ভাস্কর, শ্যামল—সবাই বলছিল, তুই নাকি একেবারে বেপাত্তা হয়ে গেছিস।
—পড়াশুনো করছি ভাই, একদম সময় পাই না।
—কিসের পড়াশুনো?
—আমি ডব্লু. বি. সি. এস পরীক্ষা দিচ্ছি।
শঙ্কর অবাক হয়ে বলল, ডব্লু. বি. সি. এস? তোর আবার এই ভীমরতি হল কেন?
—কেন, আমি পারব না বলতে চাস?
—ও তো বিদঘুটে পরীক্ষা আর বিদঘুটে চাকরি। পাস করলে চাকরি পাবি কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিসারের—আর পরীক্ষায় তোকে লিখতে হবে মঙ্গলকাব্যে সমাজচেতনা।
—তা ভাই কি করা যাবে! মোটামুটি চাকরি না পেলে তো চলবে না। এ চাকরিতে কত মাইনে পাই জানিসই তো—

—কিন্তু ওসব চাকরি করলে তোর কবিতা শুকিয়ে যাবে না ?
—যায় যাবে। বাবা শিগগির রিটায়ার করবেন।
—এ কি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে! তোরও তা হলে দায়িত্বজ্ঞান হয়েছে ? বাংলা কবিতার বড়ই দুর্দিন দেখা যাচ্ছে। তরুণ প্রতিভাবান কবি অরিন্দম লাহিড়ীর অকালে অবসর গ্রহণ ? তা-ও চাকরির জন্য ? হায় হায়! সব কবিরা এরকম কবিতা লেখা ছেড়ে মন দিয়ে চাকরি করলে দেশের উপকার হতো! যাক গে, ডব্লু· বি· সি· এস পরীক্ষা দিবি তো সন্ধ্যেবেলা এদিকে কোথায় যাচ্ছিস ?
—প্রোফেসর দত্ত'র কাছে একটু পড়াশুনো দেখে নিতে যাই—
শঙ্করের বিস্ময় উত্তরোত্তর বেড়ে যাচ্ছে। গাড়িটাকে গ্যারাজে জমা করে অরিন্দমকে নিয়ে এসে বসল লেকের বেঞ্চিতে। অরিন্দমের ছটফটানি স্পষ্ট বোঝা যায়। ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে সে। আগে অরিন্দমের হাতে ঘড়ি থাকত না।
শঙ্কর জিজ্ঞেস করল, তুই সত্যি করে বল তো অরিন্দম, তোর ব্যাপারটা কি ? না হয় চাকরির জন্য পরীক্ষা দিচ্ছিস ? আর কেউ বুঝি দেয় না ? কিন্তু সেইজন্য আড্ডা-ফাড্ডা সব ছেড়ে দিনরাত পড়াশুনো করতে হবে ? ডিগ্রি নেবার পরীক্ষাতেও তোকে কোনদিন এত পড়তে দেখিনি।
—ডিগ্রির কোন মূল্য নেই। চাকরির পরীক্ষাই আসল।
—ধুৎ, খালি চাকরি করছে। তুইও শেষ পর্যন্ত গেঁজিয়ে গেলি! এতক্ষণে তো কবিতা-টবিতার কথা একবারও বললি না। লিখছিস-টিখছিস না ?
অরিন্দম উদাসীন ভাবে বলল, কি হবে কবিতা লিখে ? কেউ পড়ে না। কেউ বোঝে না। দেশটা মূর্খে ভরে গেছে। রবীন্দ্রনাথের নামে যারা গদ্‌গদ্‌ হয়, তারাও কবিতা পড়ে না।
শঙ্কর সরু চোখে অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে বলল, দেশটা কি হঠাৎ বদলে গেল ? নাকি আগেও এরকম ছিল, তুই-ই হঠাৎ বদলে গেছিস ? তুই তো আগে বলতিস, কবিরা কবিতা লেখে নিজের তৃপ্তির জন্য। দু'একজনকে শোনালেই যথেষ্ট।
অরিন্দম বৃহৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তাহলে আমিই বদলে গেছি। না বদলে উপায় কি। সংসার বড় কঠিন ঠাঁই। আমি চলি রে, শঙ্কর। আমাকে যেতেই হবে।

—কোথায় ? প্রোফেসরের কাছে ?
—হ্যাঁ। উনি অপেক্ষা করে রাখবেন আমার জন্য।
শঙ্কর অরিন্দমের হাত ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে বলল, ওসব মামদো-বাজি ছাড় তো ! প্রফেসরের বাড়ি না ছাই। তুই কোথায় যাবি আমি ভাল করে জানি।
অরিন্দম ভেতরে ভেতরে সতর্ক হয়েও মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, কি জানিস তুই ? সত্যিই আমি···
—যাবি তো এখন ঝুমার কাছে। ঝুমা বোধহয় কোথাও দাঁড়িয়ে আছে।
অরিন্দম একটু চমকে গিয়ে বলল, ঝুমা ? না না, ঝুমা আমার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে কেন ?
—জানি সব জানি ব্রাদার। সব জানি। তোরা কবিরা মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে মেয়েদের খুব পটাতে পারিস।
—কি বলছিস যা তা !
ঠিকই বলছি। ঝুমা আমার দিকে কোনদিন তাকিয়েও দেখলে না—আর তুই শালা ছন্দ মিলিয়ে পদ্য লিখতে পারিস বলেই তোর জন্য অত প্রেম।
—তোর এটা খুব ভুল ধারণা। মেয়েরা কবিদের কক্ষনো পাত্তা দেয় না। তারা কবিদের একটু-আধটু প্রশ্রয় দেয় বটে, কিন্তু বিয়ে করতে চায় কোন কোন ডাক্তার বা ইঞ্জিনীয়ার বা চার্টার্ড অ্যাকাউণ্ট্যাণ্টকে। কিংবা তোর মতন বড়লোকের ছেলেদের।
—কিন্তু ঝুমা যে তোর প্রেমে খুবই পড়েছে, এতে আর কোন সন্দেহ নেই। সেদিন গিয়েছিলাম নিখিলের বাড়িতে, ঝুমার সঙ্গে দেখা হল। ঝুমা খালি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তোর কথা তুলছিল। আমরা যেন কেউ নই। মেয়েরা যখন প্রেমে পড়ে তখন তাদের মুখ-চোখ দেখলেই বোঝা যায়।
—কি করে বুঝলি তুই ?
—ঢের, ঢের ! নিউ লাভ ইন এভরি উইক এণ্ড। ঝুমা কোথায় দাঁড়িয়ে থাকবে বল, গাড়িটা সারানো হলে তোকে নামিয়ে দিচ্ছি।
—ভ্যাট ! ঝুমা তোকে দেখলে লজ্জা পাবে। আমি চলি।

অরিন্দম অফিসে বসে মাথা গুঁজে কাজ করছিল। পর পর দুদিন বিনা নোটিসে অফিসে আসেনি, অনেক কাজ জমে গেছে। বকুনি খেয়েছে

সুপারিনটেণ্ডেণ্টের কাছে। একেই তো কবিতা লেখে বলে অফিসের লোক তাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে, গুরুতর কোন কাজের ভার দিয়ে কেউ তাকে বিশ্বাস করে না। সবার ধারণা, সে রামপ্রসাদের মতন, জরুরী ফাইলে কবিতা লিখে ফেলবে। আজও অরিন্দম তাড়াতাড়ি পালাবার মতলবে আছে, তাই কাজগুলো সেরে ফেলছে ঝটাপট।

অরিন্দম কাজ করে একটা লম্বা হলঘরের মধ্যে, সেখানে আর অন্তত প'য়ত্রিশ ছত্রিশজন কেরানী বসে। একজন বেয়ারা এসে অরিন্দমের কাছে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে বলল, বাবু, আপনাকে একজন মেয়েছেলে বাইরে ডাকছেন।

অরিন্দম চমকে মুখ তুলে বলল, কে ডাকছে?

-- একজন মেয়েছেলে। বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।

অরিন্দমকে এরকম কেউ কখনো ডাকতে আসে না। মেয়েছেলের কথা শুনে আশপাশের দু'চারজন উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়েছে।

অরিন্দম অপ্রস্তুত হয়ে বলল, ভেতরে ডেকে নিয়ে এসো। বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছ কেন?

—উনি ভেতরে আসতে চাইছেন না। আপনাকে একবার ডাকছেন।

বেশ কয়েকটি উৎসুক কান ও চোখের সামনে অরিন্দম উঠে দাঁড়াল। কলমটা গুঁজে রাখল ফাইলের মধ্যে। টেবিল ছেড়ে চলে গিয়েও কী ভেবে আবার ফিরে এসে কলমটা তুলে নিল পকেটে।

পাশের টেবিল থেকে ভবেশবাবু মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল, কী অরিন্দমবাবু, ফিরবেন তো?

অরিন্দম বেপরোয়া ভঙ্গিতে বলল, দেখা যাক। যদি না ফিরি আপনি ফাইল-টাইলগুলো দেখবেন।

—যদি চেয়ার দখল হয়ে যায়?

—যায় যাবে!

—কি মশাই, কে ডাকতে এসেছে বলুন তো? একজন মেয়েছেলের কথা শুনেই এরকম দিলদরিয়া হয়ে গেলেন?

—আমাকে ডাকতে এসেছেন পদ্মজা নাইডু। প্রায়ই তো আসেন। নিজের প্রেস্টিজের জন্য ভেতরে ঢোকেন না।

অন্যদের হো-হো হাসি তুচ্ছ করে অরিন্দম বেরিয়ে গেল।

গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ঝুমা। মুখখানা শুকনো। অরিন্দমের অফিসের ঠিক সামনেই একটা বড় বকুল গাছ। সেই বকুলগাছের

নিচে কমলা রংয়ের শাড়ি পরা এই ম্লানমুখী বালিকা। অরিন্দম আসতেই সে সোজা তার দৃষ্টি ফেলে রাখল অরিন্দমের মুখে, কোন কথা বলল না।

অরিন্দম সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, আ রে ঝুমা! তোমাকে আমি খুঁজে খুঁজে হয়রান। কোথায় থাক আজকাল?

উল্টো অভিযোগে ঝুমা একটু থতমত খেয়ে গেল। তারপর বলল, তুমি আমাকে খুঁজেছিলে?

—হ্যাঁ। বাঃ। এখানে না, অফিসের সামনে নানান লোক—চল একটু এগিয়ে যাই—

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে ঝুমা আবার বিষণ্ণভাবে জিজ্ঞেস করল, তুমি আমায় সত্যি খুঁজেছিলে?

রীতিমতন আহত হয়ে অরিন্দম বলল, খুঁজব না?

—আমিও তোমাকে অনেক খুঁজেছি। তোমাকে পাইনি।

—তুমিও আমাকে খুঁজছ, আমিও তোমাকে খুঁজছি। কেউ কারুকে পাচ্ছি না।

—আমি তিন দিন তোমার অফিসে ফোন করেছিলাম। আমি যে আজ নিজে চলে এসেছি, এজন্য কি তুমি রাগ করেছ?

—না না, রাগ করব কেন?

—তিন দিন টেলিফোন করেছিলাম। ওরা বলল, তুমি অফিসে আসনি।

—কে বলল? নিশ্চয়ই আমাদের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট। ও একটা রাম-গাধা? মাথায় গোবর পোরা। বোকা বদমাইস।

সুপারিনটেণ্ডেণ্টের ওপর গায়ের ঝাল মিটিয়ে গালাগালি দিল অরিন্দম। ঝুমা জিজ্ঞেস করল, এ ক'দিন তুমি অফিসে এসেছিলে?

—বাঃ আসব না কেন? ক'দিন ধরে এসেই আমাকে অফিসের কাজে বাইরে যেতে হচ্ছে। একটা কেস চলছে, সেই জন্য আমাকে গিয়ে কোর্টে বসে থাকতে হয়।

ঝুমা শঙ্কিতভাবে বলল, কেস? কিসের কেস?

অরিন্দম হাসতে হাসতে বলল, আমার ব্যাপার নয়। তুমি ভয় পাচ্ছ? অফিসের পেমেণ্টের ব্যাপারে একটা পার্টি কেস করেছে। সেই ফাইল-পত্রগুলো নিয়ে রোজ আমাকে কোর্টে দৌড়তে হয়—সারাদিন বসে থাকা—বিরক্তিকর ব্যাপার।

—আমি ভাবলাম, তুমি অফিসে আসছ না, তোমার যদি জ্বর-টর হয়—তাই তোমাদের বাড়িতে পর্যন্ত গিয়েছিলাম একদিন।

—আমাদের বাড়িতে? কবে?

— কেউ তোমাকে বলেনি? তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

—না, কেউ বলেনি তো? ও, দাঁড়াও, দাঁড়াও, হ্যাঁ, মা বলছিল একটি মেয়ে কবিতা দেখাবার জন্য গিয়েছিল আমার বাড়িতে। তুমি সেই কথা বলেছিলে?

—না তো!

—তা'হলে মা বুঝতে পারেনি। এই, তুমি এর মধ্যে রোগা হয়ে গেছ কেন?

—রোগা হয়ে গেছি! না তো। আমার পরীক্ষা কী রকম হল, তুমি জিজ্ঞেস করলে না তো?

—নিশ্চয়ই ভাল হয়েছে। আমি ডিসটার্বড করতে যাইনি।

—তুমি যাওনি বলেই আমি বেশী ডিসটার্বড হয়েছি। পড়াশুনোয় মন বসেনি।

—তুমি নিজেই তো বলছিলে—

—আমি নিজেকে বুঝতে পারিনি।

—চল, ঐ চায়ের দোকানটায় বসি। আচ্ছা, এখানে না, এখানে আমাদের অফিসের লোক আসে। চল, আর একটু হাঁটি। ইডেন গার্ডেনে গিয়ে বসবে? এখন বেশ ফাঁকা—

—তোমাকে আবার অফিসে ফিরতে হবে?

—ওরে বাবা, ফিরতেই হবে। জরুরী কাজ পড়ে আছে। ঘণ্টাখানেক বাদে ফিরলেও চলবে।

আজকাল কোন জায়গাই কোন সময়ে ফাঁকা নয়। এই দুপুর রোদ্দুরেও ইডেন গার্ডেনে বসবার জন্য খালি জায়গা পাওয়া মুশকিল। তবু খানিকটা চক্কর দেবার পর সৌভাগ্যবশত ওরা জলের ধারে একটা ফাঁকা বেঞ্চ পেয়ে গেল।

অরিন্দম সিগারেট ধরিয়েছে, আঁচল দিয়ে মুখ মুছল ঝুমা। তারপর শক্ত গলায় বলল, তোমাকে একটা কথা বলব? আমাকে যদি তোমার ভাল না লাগে, তুমি সোজাসুজি বলে দিও, আমি আর কোনদিন তোমাকে বিরক্ত করতে আসব না। তোমার অফিসে এসে দেখা করতে

আমার খুব অপমান লাগছিল। তবু আমি হ্যাংলার মতন এসেছি। তুমি একদিন একটা প্রতিজ্ঞা করেছিলে বলেই আমি তোমার কাছে একটা বোঝা হয়ে থাকতে চাই না।

গোপনে ঝুমার একটা হাত চেপে ধরে অরিন্দম গাঢ়স্বরে বলল, ঝুমা, একথা বলছ কেন? তুমি জানো, আমি তোমার জন্য কতটা—

—তাহলে, সত্যি করে বলো তো, তুমি সত্যিই আমাকে খুঁজেছিলে? দু'সপ্তাহ হয়ে গেল আমার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, এর মধ্যে তুমি একদিনও আমার সঙ্গে দেখা করতে পারলে না?

—বললাম তো, তোমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেছি!

—কোথায় খুঁজলে বলো তো? একবারটি আমাদের বাড়িতে যেতে পারনি? আগে কতবার যেতে—

—তোমাদের বাড়ি যেতে লজ্জা করে। নিখিল ঠিক বুঝতে পারবে।

—বুঝলেই বা! আমি ওসব গ্রাহ্য করি না।

—আমার কিন্তু লজ্জা করে। তাছাড়া, তোমার মা কি ভাববেন! তোমাদের অবস্থা ভাল, তোমার সঙ্গে বেশ ভাল কোন ছেলের বিয়ে দেবার কথা ভেবেছেন নিশ্চয়ই। আমি তো নেহাত একটা চ্যাংড়া, আজেবাজে ছেলে—সামান্য কাজ করি—

—তুমি মোটেই আজেবাজে নও। তুমি একজন কবি।

—পৃথিবীতে কেউ তার মূল্য দেয় না।

—অন্তত একজন দেয়—

দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। অরিন্দম নিঃশব্দে সিগারেট টেনে যাচ্ছে। কিন্তু তার দৃষ্টি চঞ্চল। খুব সাবধানে আড়চোখে ঘড়িতে সময় দেখছে।

ঝুমার সেটা চোখে পড়ল। ঝুমার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যেতেই লজ্জা পেয়ে গেল অরিন্দম। সেই লজ্জা কাটাবার জন্যই বলল, কি রকম ঘড়িটা? তোমার পছন্দ হয়েছে?

ঝুমা জিজ্ঞেস করল, ঘড়িটা কবে কিনলে?

—এই তো রিসেণ্টলি।

—তোমাকে বেশ মানিয়েছে কালো ডায়ালটা। ঘড়ির ব্যাণ্ডটা ভালো নয়। আমি তোমাকে একটা ভাল মেটাল ব্যাণ্ড কিনে দেবো।

—না না, কিনতে হবে না।

—হ্যাঁ কিনব। তোমাকে নিতেই হবে।

ঝুমা তার হাত-ব্যাগের চেনটা খুলল। কি একটা জিনিস বার করল তার মধ্যে থেকে। হঠাৎ তার মুখখানা লজ্জারুণ। আস্তে আস্তে বলল, আমি তোমাকে একটা চিঠি লিখেছি। তোমার বাড়িতে পাঠাতে সাহস করিনি—যদি অন্য কেউ দেখে ফ্যালে—

—চিঠি? দেখি, দেখি।

—না, এখন পড়বে না। আমার সামনে পড়বে না, প্লীজ।

—পড়ি না! চিঠি কখনো না পড়ে বেশীক্ষণ থাকা যায়?

—এই না, না! তাহলে এখন দেবো না। পরে পড়বে।

—কি আছে চিঠিতে, বলে দাও তাহলে। দেখাই যখন হয়ে গেল, তখন চিঠির আর মূল্য থাকে না—

—কিন্তু সব কথা তো মুখে বলা যায় না।

অরিন্দম সিগারেটের শেষ টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলল জলে। বঁড়শীর ফাতনার মতন সেটা ভাসছে! চিঠিটা পকেটে রেখেই অরিন্দম অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখছে জল! শান্ত স্বচ্ছ জলে পড়ছে আকাশের ছায়া। কিন্তু বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকলে কারুর মুখও দেখা যায়। স্মৃতির মতন শান্ত এই জলেও কারুর মুখ ভেসে ওঠে।

দুপুরের একটা স্বাভাবিক থমথমে স্তব্ধতা টের পাওয়া যায় এখন এখানে। দু'দিকে গাছে দুটো পাখি পরস্পরকে উদ্দেশ্য করে গলা ফাটিয়ে ডাকছে। এই ডাকও সেই স্তব্ধতার অন্তর্গত।

ঝুমা চিঠিটা দেবার পর এখন অনেকটা সহজ হয়ে গেছে! খানিকটা আদুরে অনুযোগের সুরে বলল, তুমি বলেছিলে, ট্রেনে করে একদিন সারাদিন বেড়াতে যাবে। আমি রোজ রোজ ভাবি সেই কথা—

অরিন্দম জল থেকে চোখ ফেরাল। তারপর বলল, যাব, একদিন যাব। হঠাৎ বড্ড কাজ পড়ে গেছে। আমিও ট্রেনে বেড়াবার কথা রোজ রোজ ভাবি, প্ল্যান প্রোগ্রাম করি—কিন্তু অফিসে এত কাজ—

—অফিসে না হয় কাজ পড়েছে। বেড়াতে যাওয়া পরে হবে। কিন্তু সকালবেলা বা সন্ধ্যেবেলাও তুমি আমার জন্য একটু সময় করতে পার না? তোমাকে আমার দেখতে ইচ্ছে করে—

—তোমাকেও আমার দেখতে ইচ্ছে করে খুব।

—আমি বিশ্বাস করি না!

—কেন ?
—ইচ্ছে থাকলে, এতদিনে তুমি একবার অন্তত দেখা করতে পারতে না ?
—সকাল আর সন্ধ্যেবেলাতেও আমি আটকা পড়ে গেছি।
—কোথায় ? কোথায় আটকা পড়লে ?
—আমি সকালে আর সন্ধ্যেবেলা দুটো টিউশানি নিয়েছি।
—টিউশানি নিয়েছ ? কেন ?
—বাঃ, রোজগার বাড়াতে হবে না ? এই সামান্য টাকায় চলে ?
— তা বলে তুমি টিউশানি করবে ? তুমি যে আগে বলতে টিউশানি করা তোমার একেবারে সহ্য হয় না ! রোজ রোজ এক জায়গায় যাওয়া।
—আগে সহ্য হতো না। কিন্তু মানুষ তো জীবনে অনেক বদলায় !
—না না, টিউশানি-ফিউশানি তোমাকে করতে হবে না। তোমাকে মানায় না একদম ! অত টাকার দরকার নেই ! তাছাড়া, তুমি তাহলে লেখার সময় পাবে কখন ?
—দাঁড়াও, দাঁড়াও, বছর খানেক অন্তত টাকা জমিয়ে নিই কিছু। দুজায়গা থেকে একশো একশো দু'শো পাচ্ছি। বছর খানেক বাদে একটা খবরের কাগজে পার্ট-টাইম চাকরি পেতে পারি। সেটা পেলে—
—কোথায় টিউশানি করছ ? ছেলে না মেয়ে ?
—কেন, মেয়ে শুনলে তোমার হিংসে হবে ?
—মোটেই না ! মাস্টার-ছাত্রীর প্রেম বহুকাল উঠে গেছে। কোথায় পড়াচ্ছ ?
—সকালবেলাটা আমার বাড়ির কাছেই। একটা ছেলেকে পড়াই, এবার স্কুল-ফাইনাল দেবে। আর সন্ধ্যেবেলা নিউ আলিপুরে। খুব বড়-লোকের মেয়ে—বাংলা অনার্স—দারুণ দেখতে !
ঝুমা মুখ টিপে হাসল। হাসতে হাসতেই বলল, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে সত্যিই দারুণ দেখতে। সুন্দরী মেয়ে দেখলেই তো তুমি গদ্‌গদ হয়ে যাও। মাথা ঘুরে যায়নি তো ?
—ঘুরবো ঘুরবো করছে !
—তাহলে তো সন্ধ্যেগুলো তোমার ভালই কাটছে !
—ছাত্রীর মা বড্ড পাহারা দেয়। মেয়েটাও বড্ড খাটিয়ে নেয়। কোশ্চেনের পর কোশ্চেন।
—তোমার মতন বাচ্চা মাস্টারকে মানে ?

—মানবে না কেন ? পড়াশুনোর ব্যাপারে খুব সীরিয়াস।
—তোমাকে বড্ড খাটতে হচ্ছে। ঐ জন্য তোমার চোখের নিচে কালি।
—ধ্যাৎ ! এমন কিছু খাটুনি নয়—রোজ রোজ যাওয়া, এই যা।
—তুমি বলতে, রোজ ঠিক একসময় একই জায়গায় যেতে তোমার বিরক্ত লাগে—এতদিন এসব করোনি, আজ এখন···তুমি কিন্তু বেশীদিন করতে পারবে না।
—দেখা যাক। দেখছ না, টিউশানিতে পাংচুয়াল হবার জন্য ঘড়ি কিনতে হয়েছে !
অরিন্দম এমন কাঁচুমাচু মুখ করল যে হেসে উঠল ঝুমা। অরিন্দম অবশ্য এই ফাঁকে আবার ঘড়িতে সময় দেখে নিয়েছে। ঝুমা একটা বাদাম-ওয়ালাকে ডাকতেই তাড়াতাড়ি তাকে পয়সা দিয়েই উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চল, হাঁটতে হাঁটতে বাদাম খাওয়া যাক ! আমাকে আবার অফিসে ফিরতেই হবে।
—তোমাকে আজ অফিসে না ফিরলে চলে না ? আমার একদম যেতে ইচ্ছে করছে না এখন। ক'দ্দিন পর দেখা হল তোমার সঙ্গে !
—আমারও তো যেতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু উপায় নেই। জরুরী ফাইল ফেলে এসেছি। ওটা গিয়ে কমপ্লিট না করলে মহা ঝামেলা হবে। সুপারিনটেণ্ডেণ্ট এমন খেঁচাখেঁচি করে—
—তাহলে চল যাই। তুমি একটা টিউশানি অন্তত ছেড়ে দাও। নাহলে কি তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না নাকি ?
—কোন্ টিউশানিটা ছাড়ব বলো তো ? সকালেরটা না সন্ধ্যেরটা ?
—যে-টা হোক, একটা অন্তত ছাড়ো !
—বুঝেছি, সন্ধ্যেটাই তুমি ছাড়তে বলছ ! সুন্দরী মেয়ে বলেছি কি না, তাই তোমার হিংসে হচ্ছে !
—মোটেই না। আমি চাই তুমি রোজ আমার সঙ্গে দেখা করবে।
—হবে, হবে। ক'দিন বাদেই ঠিক ম্যানেজ করে নেব।
—শোনো, তোমার যখন সময় হবে—আমাকে বাড়িতে চিঠি লিখে জানিও, আমাদের বাড়িতে কেউ চিঠি খুলে পড়ে না। কিংবা চলেও আসতে পার—
—যাব !
বড় রাস্তায় এসে ট্রাম স্টপে দাঁড়িয়েছে। তবু যেতে ইচ্ছে করে না।

একটার পর একটা ট্রাম ছেড়ে দিচ্ছে। ঝুমার এখন কত গল্প। জব্বলপুরে ঝুমার মামার বাড়ি, পরীক্ষার পর তার সেখানে বেড়াতে যাবার কথা ছিল, মামা-মামীমা দু'খানা চিঠি লিখেছেন, তবু ঝুমা গেল না। তাহলে যে অরিন্দমের সঙ্গে দেখা হবে না। তার চেয়ে ট্রেনে করে একবেলা অরিন্দমের সঙ্গে বেড়িয়ে আসতে তার অনেক ভাল লাগবে।

ঝুমা বলল, আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি, কিংবা কোন চায়ের দোকানে বসছি। তুমি অফিসে গিয়ে চট করে কাজ সেরে এস না। একদিন একটু ছুটি দেবে না তাড়াতাড়ি?

অরিন্দম বলল, তা যদি সম্ভব হতো, তাহলে কি আমি করতুম না? কেস-টেসের ব্যাপার, এই ফাইল রাখলে কাল এমন কাণ্ড হয়ে যেতে পারে—

—তবে থাক। আমি চলে যাচ্ছি। তোমার দেরী করিয়ে দিলুম, না?

— না না, এমন কিছু দেরী হয়নি। একটু বেশীক্ষণ থাকলেই হবে।

—অফিসে এতক্ষণ কাজ করবে, তারপর বেরিয়েই আবার টিউশানি করতে যাবে? এর কোন মানে হয়?

উত্তর না দিয়ে অরিন্দম হাসল।

ট্রাম এসে গেছে, এবার ঝুমাকে উঠতে হবে। এগিয়ে যাবার আগে ঝুমা আবার লাজুক মুখে বলল, আমার চিঠিটার উত্তর দিও কিন্তু।

—হ্যাঁ, দেবো।

ট্রামের জানলা থেকে হাত নাড়ল ঝুমা, অরিন্দমও হেসে আঙুল কাঁপাল। তারপর ট্রামটা চলে যেতেই রীতিমতন ব্যস্ত হয়ে পড়ল অরিন্দম। অফিসে গেল না। অন্য একটা বাসে উঠে পড়ল।

॥ ১০ ॥

ঘরের মেঝেতে পুরু করে পাতা লালচে রংয়ের পারস্য গালিচা। দেওয়ালে কাঠের ফ্রেমে প্রায় দেড়শো রকমের বিভিন্ন রকমের পুতুল সাজানো। বিশাল রেডিওগ্রামে খুব নরমভাবে বাজছে বিদেশী গানের সুর। কোণে দাঁড় করানো বড় স্ট্যাণ্ড-ল্যাম্প থেকে লুকানো আলোয় ঘরের মধ্যে আলো-ছায়া। ডাবল-ডানলোপিলোর গদি দেওয়া সোফা-সেট। মাঝ-

খানে মস্ত বড় গাছের গুঁড়ির মতন নিচু টেবিল, গ্লাস-টপ। সেখানে রাখা দুর্লভ জাপানী টি-সেটে চা বানাচ্ছে একটি সুন্দর হাত। অরিন্দম পাশে বসে একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছে।
ডালিয়া চায়ের কাপটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এই নাও।
অরিন্দম বলল, এত দামী কাপ-ডিশে চা খেতে আমার ভয় করে। যদি ভেঙে যায়!
ডালিয়া বলল, ভাঙুক! আবার আসবে।
—এই টি-সেটটার দাম কত হবে?
- কি জানি! ঠিক মনে নেই। দেড়শো দুশো টাকা হবে বোধহয়!
—প্রায় আমার এক মাসের মাইনে!
ডালিয়া হাসতে হাসতে বলল, তাহলে এই রেডিওগ্রামটা তোমার এক বছর না দু'বছরের মাইনে?
—তুমি হাসছ? তোমার লজ্জা করে না?
—কিসের লজ্জা?
—এত টাকা নষ্ট করো তোমরা। অথচ কত লোক খেতে পায় না।
—কি করব, লোকে দেয় কেন?
—আহা-হা, দেয় কেন? অনবরত রেট বাড়াচ্ছ! পঞ্চাশ হাজার, সত্তর হাজার, এক লাখ—তোমাদের এই সবকিছু কেড়েকুড়ে নিয়ে যাওয়া উচিত।
—ঠিক আছে, নাও না! সব নিয়ে যাও! তুমি যা যা নিতে পার—আমার বাড়ি থেকে সব নিয়ে যাও। এই নাও আলমারির চাবি, এই নাও ব্যাঙ্কের লকারের চাবি—
—আমি কেন নেব? আমার কিচ্ছু দরকার নেই। আমার মাটির ভাঁড়ে চা খেলেই চলে যায়। মাটিতে শুধু একটা চাদর আর বালিশ পেতে ঘুমোতে পারি—তোমাদের এই ভালগার বিলাসিতা—
—অরিন্দম, তুমি বড্ড ঝগড়া করো। সব সময় অত রেগে রেগে কথা বলো কেন?
—সত্যি ডালিয়া, আগে আমি গরীব-বড়লোকদের ব্যাপার নিয়ে তেমন মাথা ঘামাইনি। কিন্তু তোমার এখানে এলে এখন খুব মনে হয়—এত টাকা দিয়ে কি হয়? তোমার এত গয়না—সবগুলো একসঙ্গে পরলে তোমাকে আর খুঁজেই পাওয়া যাবে না।

—এই দ্যাখো, এখন তো একটাও গয়না পরিনি। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, কেউ সুন্দর করে সাজলে কিংবা কিছু সাজালে তোমার ভালো লাগে না? যে-ভাবে ধান-চাষ হয়, গোলাপফুলের গাছও কি সেইভাবে হয়? যারা আলাদা, যাদের মধ্যে কোন বিশেষত্ব আছে, তাদের জীবনযাত্রা একটু অন্যরকম হবেই।
—খুব উপমা দিয়ে কথা বলতে শিখেছ তো?
—তোমার কাছে শিখেছি।
—আচ্ছা ডালিয়া, তুমি কোনদিন গরীব ছিলে না? তোমার সেইসব দিনের কথা মনে পড়ে না?
—তুমি বুঝি ভাবছ, সিনেমা স্টার হয়ে আমি হঠাৎ-বড়লোক হয়েছি? আমার বাবার সুগার-মিল ছিল। আমার স্বামীর পাঁচখানা বাড়ি ছিল এলাহাবাদে।
—ও, অবনীবাবুকে চা দিলে না?
—অবনী সন্ধ্যের পর চা খায় না। তোমার মতন তো নয় সবাই।
—আচ্ছা, অবনীবাবু কি কোন কাজ-টাজ করেন?
—কাজ? কি কাজ?
—কোন চাকরি-টাকরি বা ব্যবসা-ট্যাবসা, কিছু একটা কাজ—
—যার বাবা তেইশ লাখ টাকার সম্পত্তি রেখে গেছে, সে কাজ করবে কোন্ দুঃখে? ও কাজ করতে জানেই না।
—বাবাঃ, টাকা আছে বলেই নিষ্কর্মা বসে থাকবে, এটা একটা জঘন্য জিনিস!
—ওকে ঠিক নিষ্কর্মা বলতে পার না। রেস খেলে ও নিজের টাকাকড়ি সব উড়িয়েছে। এখন আমার টাকা ওড়াচ্ছে। দ্যাখো না গিয়ে, শুয়ে শুয়ে ও ঘোড়ার বই পড়ছে।
—*এটা আমার ভারী অদ্ভুত লাগে। উনি কক্ষনো এঘরে আসে না?*
—কেন আসবে না? আমি ডাকলেই আসবে। না ডাকলে ওর আসা নিষেধ।
—এটা কি ধরনের বিয়ে? স্বামী পাশের ঘরে শুয়ে থাকবে, আর বউ অন্য ঘরে একজনের সঙ্গে বসে বসে—
ডালিয়া হাসতে লাগল। হাসির ধমকে দুলে দুলে উঠে হাসি থামাবার জন্য মুখে চাপা দিল। অরিন্দম অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, হাসছ

কেন ?

ডালিয়া তখনো হাসতে হাসতে বলল, আমি ভাবলুম, তুমি বলতে যাচ্ছ, স্বামী পাশের ঘরে বসে থাকবে, আর স্ত্রী অন্য ঘরে একজনের সঙ্গে শুয়ে শুয়ে—

—এই, অসভ্য কথা বলবে না !

—বলিনি তো সবটা। তোমার সঙ্গে আলাপ হবার পর আমি একটাও অসভ্য কথা বলিনি। আগে খুব বলতাম।

—কেন বলতে ?

—ঐ রকমই আমার অভ্যেস। তুমি আমাকে শুধরে দাও। একদম ভাল করে দাও! আমাকে অনেক বই পড়ে শোনাও। তুমি রোজ আমাকে নানারকম বই পড়ে শোনাবে ? আমি ভাল বই কিছু পড়িনি !

—আমি তোমার মাস্টার হব নাকি ?

—হও না ! তোমাকে অনেক টাকা দেবো !

—আমার দ্বারা হবে না ওসব ! আমাকে টাকার লোভ দেখাচ্ছ ?

—না না, লোভ দেখাইনি। ওটা এমনি মুখে এসে গেল। আমি যে জগতে থাকি, যাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়, তারা সবাই তো টাকার কথা বলে। তোমাকে আর বলব না ! তুমি অন্যরকম। তোমাকে মাস্টারী করতে হবে না। তুমি আমাকে একটু ভালবাসবে ? একটু নয়, খুব ভালবাসবে ? দারুণ, অসম্ভব ভালবাসতে পারবে ? ভালবেসে আমাকে পাগল করে দিতে পারবে ?

—এটা কোন্ সিনেমার ডায়লগ ছিল ?

—তার মানে ?

—এটা তোমার নিজের কথা ? না কোন ছবিতে তোমার পার্টে এরকম কথা ছিল ?

—আমি নিজে কিছু বলতে পারি না ? তুমি আমাকে বিশ্বাস করছ না ?

—না, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না।

—কি হলে তোমার বিশ্বাস হবে ? তোমার জন্য আমি অনেক কিছু ছাড়িনি ?

—আমার মনে হয়, তুমি সব সময় আমার সঙ্গে অভিনয় করছ। কোনটা অভিনয়, কোনটা সত্যি আমি ঠিক বুঝতে পারি না।

—হোক না অভিনয়। অভিনয় কি ভাল লাগে না ?

—অভিনয় দূর থেকে দেখতে ভাল লাগে। এত পাশাপাশি বসে অভিনয় দেখাটা অসহ্য ব্যাপার। তাহলে আমাকেও অভিনয় করতে হয়।
—তুমিও করো।
—আমি পারি না।
—আমাকে তোমার খারাপ লাগছে?
—যদি সবটাই তোমার অভিনয় হয়, তাহলে খারাপ লাগবে। আমার কি মনে হয় জানো, তুমি আমাকে নিয়ে কিছু একটা খেলা খেলছ। আমিও না এসে পারি না।
—খেলা হলেই বা ক্ষতি কি? যদি খেলাটা দু'জনেরই ভাল লাগে! আমি সারাজীবন তোমার বন্ধু থাকব, সারা জীবন শুধু তোমার একার বন্ধু থাকব—এরকম কোন গ্যারান্টি তো দিইনি!
—সে-রকম গ্যারান্টি আমি চাইওনি!
—তবে? যদি খেলাও হয়, যে-ক'দিন খেলতে ভাল লাগবে সে ক'দিন আনন্দ করা উচিত নয়? জীবনটা এত একঘেয়ে—
—তোমার সম্পর্কে একটা কথা শুনেছিলাম, প্রায়ই ভাবি তোমাকে জিজ্ঞেস করব। এ কথা কি সত্যি যে তুমি মাঝে মাঝেই একজন করে নতুন ছেলের প্রেমে পড়ো—কিছুদিন বাদেই তাকে ত্যাগ করে আবার আরেকজনকে—
—কথাটা পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারব না।
—আমিও বুঝি সেই রকম?
—না, তুমি আলাদা, তুমি ভীষণ রকম আলাদা। তোমার সঙ্গে আমার ব্যাপারটা একেবারে অন্য রকম। এ তো শুধু প্রেম প্রেম খেলা নয়। এ তো জীবনটাকেই বদলে দেবার ব্যাপার। আমি কোনদিন এরকম জীবন কাটাইনি। তুমি এটা বুঝতে পারো না?
—আচ্ছা ডালিয়া, সত্যি করে বলো তো, প্রথম যেদিন পার্টিতে তোমাকে দেখি, যেদিন আমি একটু ড্রাঙ্ক হয়ে গিয়েছিলাম—সেদিনকার কথা তোমার মনে আছে? একটুও মনে আছে?
—কেন মনে থাকবে না? তুমি বার বার 'আলাপ করতে চাই, আলাপ করতে চাই' বলছিলে। এমন ছেলেমানুষের মতন দেখাচ্ছিল তোমাকে—
—তাহলে চন্দননগরে মামার বাড়িতে যেদিন আবার দেখা হল, সেদিন

আমাকে না-চেনার ভান করছিলে কেন ?
—আমাদের ওরকম করতে হয়। সবাই আলাপ করতে চাইলেও আমাদের আলাপ করতে নেই।
—তাহলে চন্দননগরে ওরকম মিষ্টি মিষ্টি কথা বলছিলে কেন ?
—বাঃ, সেটা তোমাদের বাড়ি ! সেখানে কি তোমাকে অপমান করতে পারি ?
—তাই বুঝি সেই শনিবার স্টুডিওর মধ্যে আমাকে অপমান করে তার শোধ নিলে ?
—সেদিন আমার মুডটা একটু অন্যরকম ছিল। সেদিন তোমাকে দেখে আমার ভাল লাগছিল, আবার তোমাকে আঘাত করতেও ইচ্ছে করছিল। অপমান করলে তোমাকে কী রকম দেখায়—
—মানুষকে অপমান করতে কিংবা আঘাত দিতে তোমার ভালো লাগে ?
—মাঝে মাঝে আমার ঐ রকম শখ হয় !
—সেই জন্যই বিকুকে পাঠালে ?
—না না, ঐরকম আঘাত নয় প্লীজ, ওকথা আর বোল না।
ডালিয়া অরিন্দমের একটা হাত চেপে ধরল। আন্তরিক ব্যাকুলতার সঙ্গে বলল, ও কথা আর উচ্চারণ কোর না। আমার জন্য কেউ মার খাবে আমি কল্পনাই করতে পারি না। আমি ভায়োলেন্স একদম সহ্য করতে পারি না। তুমি জানো না, ঐ জন্য আমি কাগজ পড়ি না, রেডিও শুনি না—এমনকি মুরগী কাটাও দেখতে পারি না। বিকুকে মাইনে দিয়ে রেখেছিলাম, ভিড় থেকে আমাকে বাঁচাবার জন্য—
অরিন্দম হাসতে হাসতে বলল, আমার কিন্তু এখনো রাগ যায়নি। তোমার কাছে আমি এই নিয়ে আট-দশদিন এলাম—তবু এখনো আমার রাগ আছে।
—তোমার বড্ড বেশি রাগ ! তুমি কি বেশী ঝাল খাও ! তুমি বাঙাল নাকি ? আচ্ছা, কি করলে তোমার রাগ যাবে ? তোমার পায়ে ধরে আমি ক্ষমা চাইব ?
—হ্যাঁ, তাই চাও।
—তুমি ভাবছ আমি তোমার পায়ে ধরতে পারি না ? তুমি আমাকে যে-রকম যাদু করেছ—আমি এখন তা-ও পারি !
—তা হলে ধরো।

দ্বিরুক্তি করল না ডালিয়া। তক্ষুনি সোফা ছেড়ে কার্পেটে বসে পড়ে চেপে ধরল অরিন্দমের চটি-পরা পা। গ্রীবা উঁচু করে বলল, প্রভু, তোমার রাগ মিটেছে ?
অরিন্দম হাসতে হাসতে বলল, হয়েছে, হয়েছে, এবার ছাড়ো !
ডালিয়া কুটুস করে অরিন্দমের পায়ে একটা চিমটি কেটে বলল, এবার তুমি আমার পা ধরে ক্ষমা চাও !
—বাঃ, আমি কেন ক্ষমা চাইব ? আমি কি দোষ করেছি ?
—এই যে আমি তোমার পা ধরলাম, এর জন্য ক্ষমা চাও।
—মোটেই না।
সম্রাজ্ঞীর মতন অহঙ্কারী মুখে ডালিয়া বলল, তোমাকে আমার পা ধরতেই হবে। আমার হুকুম।
অরিন্দম নেমে এল কার্পেটে। সুষমামণ্ডিত পা দুটিতে হাত ছুঁইয়ে আবেগপ্লুত গলায় বলল, 'দেবী, আমি তব মালঞ্চের হব মালাকার !'
ডালিয়া চেঁচিয়ে ডেকে উঠল, অবনী অবনী ?
অরিন্দম ধড়মড় করে উঠে পড়তে যাচ্ছিল, ডালিয়া তাকে টেনে ধরে রেখে বলল, এই, উঠছ কেন ? বসো, বসো !
দরজার কাছে এসে দাঁড়াল অবনী সোম। বেঁটেখাটো, গোলগাল পুরুষ। অত্যধিক মদ্যপানে চোখ দুটি অস্বচ্ছ। জামাটা খুব দামী, কিন্তু তার পা-জামার দড়ি নেই। পেটের কাছে হাত মুঠি করে ধরা। অরিন্দমের দিকে সে তাকালই না, ডালিয়াকে জিজ্ঞেস করল, কি ?
—ছক্কুকে বলো গেট খুলে দিতে। আর ড্রাইভারকে গাড়ি বার করতে বলো। আমরা একটু বেরুব।

অবনী সোম স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইল। এখন সে দেখছে অরিন্দমকে। সে দৃষ্টিতে রাগ কিংবা ঘৃণা কিছুই নেই। অরিন্দমের খুবই অস্বস্তি লাগছে। সে আর ডালিয়া মেঝের ওপর বসা—ডালিয়া জোর করে তার হাত চেপে ধরে রেখে উঠতে দিচ্ছে না।

ডালিয়া ধমক দিয়ে স্বামীকে বলল, দাঁড়িয়ে রয়েছ কি ? ড্রাইভারকে ডাকতে বললাম না ?
অবনী এবার মুখ খুলল। অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর। জিজ্ঞেস করল, আমাকেও কি বেরুতে হবে ? আমি এখন বেরুতে পারব না।
—তোমাকে তো যেতে বলিনি !

—ঠিক আছে !

অবনী চলে যাবার পর অরিন্দম লজ্জিতভাবে জিজ্ঞেস করল, এরকম করার মানে কি ? ওকে এখন না ডাকলে চলত না ?

ডালিয়া দুষ্টুমির হাসি হেসে বলল, এটাও একটা খেলা। এরকম খেলা খেলতে বেশ ভাল লাগে।

—উনি কখনো কিছু বলেন না ?

দু'তিন মাস অন্তর এক-একদিন আমাকে চাবুক নিয়ে তাড়া করে।

—সেকি ?

—ভয় পাচ্ছ ? আমিও তখন একটা চাবুক নিয়ে ওকে মারি। বললাম তো, এটা একটা খেলা।

—পৃথিবীতে কত অদ্ভুত খেলা আছে, তাই দেখছি।

—তুমি ছেলেমানুষ, আরও অনেক কিছু দেখবে।

—আমি ছেলেমানুষ ! তুমি বুড়ি ? আচ্ছা, এরকম কোন বিয়ের মানে কি ?

—এক হিসেবে কোন মানে হয় না। ফিল্ম-আর্টিস্টদের বিয়ে করা উচিত নয়। আইন করে তাদের বিয়ে বন্ধ করে দেওয়া উচিত। শুধু ফিল্ম-আর্টিস্ট কেন, লেখক, কবি—এদের বিয়ে করা উচিত নয় একদম।

—তোমাকে আগে আমি বোকাসোকা একটা আদুরে মেয়ে বলে মনে করতাম—এখন দেখছি, তুমি তা নও।

—বোকা হলে আর্টিস্ট হওয়া যায় না।

—ফিল্মের মেয়েদেরও যে আবার আর্টিস্ট বলা যায়, একথাও আমি এতদিন মানতুম না।

—এখন মানো ?

—একটু একটু !

—ইস্ ! আরও কয়েকদিন দ্যাখো। তখন বুঝবে।

—গাড়ি বার করতে যে বললে, কোথায় যাব ?

—জাহান্নমে। তুমি সেখানকার রাস্তা চেনো ?

—তুমি চেনো নাকি ?

—হ্যাঁ চিনি। সেখানে গাড়ি করে যাবার দরকার নেই।

—ঘরে বসে বসেই—

গাড়িতে উঠে ডালিয়া ড্রাইভারকে বলল, গঙ্গার ধারে চক্কর মারো।

থামবে না কোথাও।—অরিন্দম, এখন ক'টা বাজে?
—ন'টা।
—কিছুই না। ইচ্ছে হলে সারারাত ঘুরব। অরিন্দম, তুমি থাকতে পারবে?
—হ্যাঁ পারব।
—চলো ডায়মণ্ডহারবার যাই, কিংবা কোন একটা জায়গায় চলে যাই—
—কাল তোমার শুটিং আছে না?
—ইস্, কেন মনে পড়িয়ে দিলে? তুমি কি আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি নাকি? কাল সারাদিন শুটিং—সন্ধ্যের পরও আছে একটা হোটেলে—কাল তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।
—পরশু আসব।
—না, তুমি কাল শুটিংয়ের সময় থাকবে। তোমাকে একদিন না দেখলেই আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।
—তুমি না বলেছিলে, তোমার শুটিং-এর সময় অন্য কেউ উপস্থিত থাকলে তোমার খারাপ লাগে?
—অন্য কারুর কথা আলাদা, তোমার কথা আলাদা।
—আমাকেই তো বলেছিলে।
—সে তো অনেকদিন আগে। সেই আমি তো আর নেই। আমি বদলে গেছি। সত্যি, কি রকম যেন বিশ্বাস করা যায় না—
—সত্যি বিশ্বাস করা যায় না! আমি যে তোমার পাশে বসে আছি, মনে হয়, এটা যেন স্বপ্ন।
—খুব তো টেলিফোনে রাগ দেখিয়ে বলেছিলে, কোনদিন আমার কাছে আসবে না,' আমার মুখ দেখবে না। তেজ দেখিয়ে টেলিফোন নামিয়ে রেখে দিলে। আমার নাম ডালিয়া সোম, আমি কারুর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বললে সে কক্ষনো আগে টেলিফোন নামিয়ে রাখার সাহস পায় না। আমিই চিরকাল আগে রাখি। তুমিই প্রথম—কিন্তু আমি জানতাম, তোমাকে আসতেই হবে—
—ইস্, তোমার খুব অহংকার না?
—হ্যাঁ, আমি অহংকারী। আর সেজন্য আমার একটুও লজ্জা নেই!
—আমি কোনদিন আর তোমার মুখ দেখব না প্রতিজ্ঞা করেছিলাম!
—আসতে তোমাকে হতোই! তুমি না এলে আত্মহত্যা করতাম!

—সত্যি ?

--হ্যাঁ, সত্যি !

—তোমার অহংকারে ঘা লাগত বলে ?

– হয়তো তাই। কিংবা তাও নয় ! তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়া আমার নিয়তি ছিল !

—আমি নিজেও বুঝতে পারি না, কি করে এরকম হয়ে গেল। তুমি কি করে বুঝতে পারলে ?

—মেয়েরা এসব বুঝতে পারে। আচ্ছা অরিন্দম, তুমি তো আমার কাছে কিছুই চাও না। তবু আমার কাছে আস কেন ?

—কি জানি ! না এসে পারি না। কাজকর্ম সব গোল্লায় গেছে। মনে হয়, তোমার মধ্যে একটা চুম্বক আছে, আমাকে মারাত্মক ভাবে টানে।

—চুম্বক ? কোথায় চুম্বক বসানো আছে ?

চুম্বক কথাটা বলেই অরিন্দম একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। আস্তে আস্তে বলল, তা জানি না। এখনো সেটা ঠিক দেখতে পাইনি।

—দেখবে ? সব খুলে দেবো ?

—এই, কি হচ্ছে কি ? ড্রাইভার শুনতে পাবে—

—ড্রাইভার বাংলা বোঝে না। তোমাকে নিয়ে মহা মুশকিল, একটুও এদিক-সেদিক কথা বলা যাবে না।

—সেই চুম্বকটা চোখে দেখা যায় না।

—আমার কাছে যারা আসে, তারা সবাই কিছু না কিছু চায়। সবাই লোভী। কিন্তু তুমি তো কিছু চাও না ! তুমি তো আমাকে ছুঁয়েও দেখতে চাও না !

অরিন্দম বলল, তোমার ব্যাপারটা—অনেকটা মেরিলিন মনরো আর আর্থার মিলারের মতন। তুমি জানো ঘটনাটা ?

—না। আর্থার মিলার কে ?

—বিখ্যাত নাট্যকার ! তুমি সিনেমায় 'মিসফিট' কিংবা 'ডেথ অফ এ সেলসম্যান' দেখনি ?

—দেখিনি। ওদের গল্পটা কি শুনি ?

—আর্থার মিলারের বাড়িতে মেরিলিন মনরো একদিন ডিনার খেতে এসেছিল। তখন মেরিলিন মনরোর সাঙ্ঘাতিক নাম—খাওয়ার টেবিলে শুধু ওরা দুজন, আর কেউ নেই। মেরিলিন মনরোর মনে হল, আর্থার

মিলার মানুষটা খুব একা। সব লেখকই নিঃসঙ্গ হয়। আর্থার মিলারের দুঃখময় জীবনের কথা শুনতে শুনতে মেরিলিন মনরো কেঁদে ফেলেছিল। তারপরই মেরিলিন মনরো আর্থার মিলারকে বিয়ে করতে চাইল। সারা পৃথিবী অবাক। হলিউড যার নামে পাগল, সেই মেরিলিন মনরো বিয়ে করতে গেল তার ডবল-বয়েসী একজন বুড়ো লেখককে। শুধু তাই নয়, মেরিলিন চেয়েছিল আবার লেখাপড়া শুরু করতে। অবশ্য কিছু-দিন পরে মেরিলিন মনরো আত্মহত্যা করেছিল—

—হ্যাঁ, ওর আত্মহত্যার ঘটনাটা জানি। ভারী চমৎকার! আমারও ইচ্ছে করে ঐ ভাবে আত্মহত্যা করতে।

—যাঃ, তুমি আত্মহত্যা করবে কেন?

—করব, ঠিক করব! দেখো একদিন—কিন্তু গল্পটা তো মিলল না। আর্থার মিলারের ডবল-বয়েস ছিল, কিন্তু তুমি তো আমার থেকেই ছোট।

—মোটেই ছোট নই।

—হ্যাঁ, বিশ্বাস করো। সিনেমা ম্যাগাজিনে আমার বয়েস বেরোয় তেইশ, কিন্তু আসলে আমার বয়েস ছাব্বিশ।

—তা হলে তুমি আমার সমান। আমার সার্টিফিকেট এজ চব্বিশ হলেও আসলে ছাব্বিশ।

—ছেলেরাও তা হলে বয়েস লুকোয়!

হেসে গড়িয়ে পড়ল ডালিয়া। গাড়ি যাচ্ছে আউটরাম ঘাট দিয়ে। হু হু করছে হাওয়া।

অরিন্দম বলল, চল, এখানে একটু নাবি। আমার জল দেখতে খুব ভাল লাগে।

ডালিয়ার মুখখানা ম্লান হয়ে গেল। বলল, আমার কি ভাল লাগে না? আমার কি ইচ্ছে করে না? কিন্তু কোন উপায় নেই। আমি নেমে দাঁড়ালেই এমন ভিড় হয়ে যাবে যে তুমিও বিপদে পড়বে।

—তা হলে থাক দরকার নেই!

ডালিয়া বিরক্ত হয়ে বলল, দূর ছাই, ভাল লাগে না। ইচ্ছে মতন কিছু করার উপায় নেই। শোনো, এক কাজ করবে? চল, আমরা কলকাতার বাইরে কোথাও ঘুরে আসি কয়েকদিন! যাবে? প্লীজ, না বোল না—

—কিন্তু তোমার যে অনেক কাজ।

—থাকুক কাজ! আমার বুঝি অসুখ করতে পারে না?

তোমার কাজগুলো সেরে নাও। কয়েক দিন পরে না হয়—
—পরে টরে না? এই খেলাটা যদি হঠাৎ ভেঙে যায়! দূরের কথা ভেবে প্ল্যান করতে নেই। মানুষের জীবনটা কত ছোট, যৌবন আরও ছোট।
—ডালিয়া, তুমি বেশ ভাল কথা বলতে পার।
—ওসব থাক, যাবে কিনা বলো। দার্জিলিং যাবে? চল পরশুই চলে যাই।
—এত তাড়াতাড়ি ট্রেনের টিকিট পাওয়া যাবে না।
—ট্রেনে? কতকাল ট্রেনে চড়িনি! খুব ইচ্ছে করে, কিন্তু উপায় নেই। যাকগে, ট্রেন-ফেন নয়, প্লেনে যাব। সে টিকিটের কথা তোমাকে ভাবতে হবে না। যাবে কি না বলো—
—তুমি বললে না-গিয়ে আমার উপায় নেই। আমাকে যেতেই হবে।
—গুড্! এই তো ভাল ছেলে। তাহলে পরশুই!
—তাহলে চল, এখন বাড়ি যাওয়া যাক।
—এর মধ্যেই কি? আমার ড্রাইভার তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আসবে। আজ কবিতা শোনাবে না?
—এই অন্ধকারের মধ্যে কি করে শোনাব?
—গাড়ির ভেতরের আলো জেবলে দিচ্ছি! তোমার মুখস্থ নেই?
অরিন্দম লজ্জা পেয়ে বলল, আজ থাক। বলেই আপন-মনে হাসল। এক সময় ডালিয়াকে কবিতা শোনাবার জন্য সে পাগল হয়ে উঠেছিল। এখন ডালিয়া নিজে থেকে তাকে অনুরোধ করছে। পৃথিবীতে কত আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে যায়।
ডালিয়া অরিন্দমের বাহু ছুঁয়ে বলল, দু'চার লাইন অন্তত বলো। আমি সব বুঝতে পারি না, তবু আমার ভাল লাগে, মনে হয় অন্য জগতের কথা—
অরিন্দম মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে আবৃত্তি করল ঃ

ভ্রূ-পল্লবে ডাক দিলে···এতকাল ডাকনি আমায়।
কাঙালের মত আমি এত একা, তোমার কি মায়া হয়নি ;
শোননি আমার দীর্ঘশ্বাস?
হৃদয় উন্মুক্ত ছিল, তবুও হৃদয় ভরা এমন প্রবাস···
আমার দুঃখের দিনে বৃষ্টি এল, তাই আমি আগুন জেবলেছি
সে কি ভুল?···

ডালিয়া বাইরের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে আছে। তার চোখ সমস্ত

দৃশ্য পেরিয়ে আরও অনেক দূরে। তার শরীরে অদ্ভুত সুগন্ধ। বরবর্ণিনী শরীরখানা এখন মায়াময় মনে হয়।

অরিন্দম কবিতা শেষ করার পর ডালিয়া অস্ফুট গলায় বলল, সত্যি, অন্য জগতের ভাষা! আমি বুঝতে পারি না কিছুই। তবু তোমার মুখে শুনতে ভালো লাগে! আচ্ছা, অরিন্দম, সত্যি করে বলো তো, তুমি আমার কাছে আস কেন? তুমি তো কিছুই চাওনি আমার কাছে—

—ঐ যে বললাম, তোমার মধ্যে একটা চুম্বক আছে, আমাকে টানে।

—না, ঐ সব চুম্বক-টুম্বক নয়। সত্যি করে বলো। আমাকে তো তুমি ঘৃণা করতেও পারতে!

—ঘৃণা করব কেন?

—আমি তো পবিত্র নই। আমি তো তোমাদের মত মানুষের স্তুতির যোগ্য নই। আমার মতন ফিল্ম-অ্যাকট্রেসের জন্য অনেক লোক পাগল হয় ঠিকই, কিন্তু কেউ কেউ আমাদের ঘেন্নাও করে। আমি তা-ও জানি। তুমিও তো আমাকে ঘেন্না করতে পারতে! অন্যরা যে-জন্য আমাদের কাছে আসে, তুমি তো তা চাওনি।

—এই ডালিয়া কি হচ্ছে কি? কি সব পাগলের মতন বলছ!

—তুমি জানো না, আমার ভেতরটা কি রকম ছটফট করছে। সত্যি করে বলো, কেন আস আমার কাছে?

—ঠিক বুঝিয়ে বলা যাবে না। তুমি এত সুন্দর, তুমি দুর্লভ—তোমাকে জয় করার একটা অদ্ভুত আনন্দ আছে। মানুষ যে-জন্য চাঁদে যায়—। আমি সাধারণ মানুষ, সাধারণ মানুষকে নিয়ে লিখব—কিন্তু তোমার মতন দুর্লভকে জয় করার ইচ্ছে, মানুষের কোনদিন যাবে না।

—অরিন্দম, সত্যি কি আমি সুন্দর?

—ডালিয়া, তোমার তুলনা নেই!

—আমি একটা কথা বলব, শুনবে? সত্যিকারের সুন্দর আসলে তুমিই। মেয়েদের চেয়ে পুরুষরাই বেশী সুন্দর হয়। তোমার ঐ পাতলা ছিপছিপে চেহারা—ঝকঝকে দুটো চোখ, এলোমেলো চুল—এই তো আসল সুন্দর।

—যাঃ! কি যা-তা বলছ?

—ঠিকই বলছি। মেয়েদের নিয়ে তোমরা বাড়াবাড়ি করো—পুরুষদের রূপের কথা কেউ বলে না! মেয়েদের সাজপোষাক লাগে—পুরুষদের

তাও লাগে না !

—অন্য মেয়েদের কথা আলাদা আর তোমার কথা আলাদা। অরিন্দম একদৃষ্টে চেয়ে রইল ডালিয়ার দিকে। ডালিয়ার একটা হাত তার হাতের ওপর রাখা। তার আঙুলগুলো নিয়ে খেলা করতে করতে বলল, ডালিয়া, তুমি এত সুন্দর যে তাকালে যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। আমি কবিতা লিখি, বানিয়ে বানিয়ে অনেক কিছু বলতে পারি—কিন্তু তোমাকে দেখে আমি বর্ণনার ভাষা খুঁজে পাই না। একটাও শব্দ মনে পড়ে না—

ডালিয়া নতমুখী হয়ে বলল, আজ মনে হচ্ছে, এর আগে কেউ কোনদিন আমাকে সুন্দর বলেনি। তুমিই প্রথম বললে।

—এর আগে কেউ বলেনি ? হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ লোক—

—তারা সব আলাদা। তুমি আলাদা। শোনো, পরশুদিন দার্জিলিং যাওয়া ঠিক তো ? ভুলবে না ?

—না, ভুলব না।

—দার্জিলিংয়ে শুধু তুমি আর আমি। কোন কাজ নয়, কোন চেনা মানুষ নয়—উঃ, ভাবতেই আমার এমন থ্রিলিং লাগছে—তুমি যদি এখন যেতে না চাও, তাহলে আমি ঠিক আত্মহত্যা করব।

অরিন্দম বলল, না, আমি যাব। আমি অন্য আর সবকিছু ভুলে গেছি!

॥ ১১ ॥

প্লেনটা এবার বাগডোগরায় নামবে। সবাই কোমরে সীট-বেল্ট বাঁধছে। ডালিয়া অরিন্দমকে হুকুম করল, তুমি আমারটা বেঁধে দাও।

অরিন্দম ভুরু কুঁচকে বলল, খুকুমণি, তুমি তোমার নিজের বেল্টটাও বাঁধতে পার না ?

ডালিয়া অহঙ্কারের সঙ্গে বলল, পারি না তা নয়। তবে নিজের কোন কাজ করার অভ্যেস আমার নেই। সব সময়ই অন্য কেউ না কেউ করে দেয়।

—এই সেরেছে ! দার্জিলিংয়ে গিয়ে তুমি আমাকে চাকরের মতন খাটাবে নাকি ?

অহঙ্কারী মুখখানা বদলে ডালিয়া খুব মিষ্টি করে হাসল। তারপর বলল, না, দার্জিলিংয়ে আমি তোমার দাসী হয়ে থাকব।

এর পরের কয়েকটা মুহূর্ত ওরা তাকিয়ে রইল পরস্পরের চোখের দিকে। ছেলেমানুষের মতন। যেন ওরা স্ট্যাচুর খেলা খেলছে! পৃথিবীতে আর কিছু নেই, শুধু চোখের সামনে চোখ। পলক পড়ছে না। কি দেখছে, তা শুধু ওরাই জানে। তারপর জানলার বাইরে তাকাল ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসা পৃথিবীর দিকে। একটু আগে যা ছিল শুধু সবুজ ও ছাই-রংয়ের চৌখুপি ছকের মতন, এখন সেখানে আস্তে আস্তে নদী, মাঠ ও গাছপালা ফুটে উঠছে। সব কিছুই পুতুল খেলার জগতের মতন। এখান থেকে মানুষের জীবনটাকেও পুতুল খেলা মনে করা যায়।

ডালিয়া বলল, উঃ, কানে যা ব্যথা করছে! তোমার করছে না? ল্যাণ্ড করার সময়টা আমার বিচ্ছিরি লাগে!

অরিন্দম এর আগে কখনো প্লেনে চাপেইনি। সব কিছুই তার কাছে নতুন। কানের ব্যথাটা সে ভেবেছিল বুঝি তারই একার হচ্ছে। ডালিয়ার কথা শুনে ভারিক্কী চালে বলল, আমার কোন অসুবিধা হয় না। অভ্যেস হয়ে গেছে।

যে এয়ার হোস্টেসটি এতক্ষণ তাদের বেশী বেশী যত্ন করছিল, এবার সে এসে ছোট্ট একটা খাতা ধরে ডালিয়াকে বলল, একটা অটোগ্রাফ দিন।

সে চলে যাবার পর অরিন্দম বলল, এই বুঝি শুরু হল! দার্জিলিংয়ে যদি তোমার ফ্যানদের পাল্লায় পড়

ডালিয়া বলল, তোমার হিংসে হয় না?

—কেন, হিংসে হবে কেন?

—আমার কাছে অটোগ্রাফ চায়, কিন্তু তুমিও তো একজন কবি, তোমার কাছ থেকে কেউ চায় না!

—আমার বয়ে গেছে! তোমাকে যখন ফ্যানরা ঘিরে ধরে, তখন তোমার ভাল লাগে?

—অনেকে মিলে ঘিরে ধরলে খুবই বিরক্ত লাগে। কিন্তু যদি কেউ একেবারে চিনতে না পারে, তাহলে খারাপ লাগে। বিলেতে শুটিং করতে গিয়েছিলুম একবার—সেখানে কেউ চিনতে পারেনি।

—তুমি বিলেত গিয়েছিলে? কোন সালে বলো তো?

—এই তো সিক্সটি নাইনের মে মাসে!

—আরে! ঐ সময়টা তো আমিও বিলেতে ছিলাম। তখন যদি তোমার সঙ্গে দেখা হতো!

ডালিয়া হাসিমুখে তাকাল অরিন্দমের দিকে। বলল, সত্যিই তোমার সঙ্গে তখন দেখা হলে ভালো হতো!

অরিন্দম কখনো কলকাতার থেকে তিনশো মাইলের বেশী দূরে যায়নি। তবু সে অবলীলাক্রমে বলে গেল, আমার হোটেলটা ছিল টেমস নদীর ঠিক পাশেই—এত চমৎকার!

—কি নাম ছিল হোটেলের?

—চল, নামতে হবে।

এয়ারপোর্টের বাইরে আসবামাত্র একজন উর্দি-পরা ড্রাইভার এসে ডালিয়াকে লম্বা একটা সেলাম করল। তার সঙ্গে মস্তবড় একটা গাড়ি। অরিন্দম হকচকিয়ে গিয়ে বলল, এই গাড়ি এল কোথা থেকে? তুমি যে আসবে, কেউ খবর পেয়ে গেছে?

ডালিয়া মুচকি হেসে বলল, সব ব্যবস্থা হয়ে থাকে। ওসব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।

—আমার মাল-পত্তর?

—ড্রাইভারকে লাগেজ-শ্লিপ দিয়ে দাও। ও নিয়ে আসবে।

অরিন্দম ঠিক সপ্রতিভ হতে পারছে না। তার কাছে এ-সবই নতুন অভিজ্ঞতা। একটি মেয়ে সব ব্যবস্থা করে ফেলেছে, পুরুষসঙ্গী হয়েও তার কিছুই করার নেই। জোর করে অরিন্দম তার আড়ষ্টতা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করল।

শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিংয়ের রাস্তা। শহর ছাড়িয়ে গাড়ি ফাঁকা জায়গায় ছুটছে। অরিন্দম তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। ডালিয়া জিজ্ঞেস করল, তুমি এর আগে এসেছ দার্জিলিংয়ে?

একটুও দ্বিধা না করে অরিন্দম বলল, হ্যাঁ, আর একবার এসেছিলাম, কুচবিহারের রাজকুমারের সঙ্গে।

—ও, তাই বুঝি?

—হ্যাঁ। আমি কিছুদিন কুচবিহারের রাজকুমারের প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলাম তো!

—প্রাইভেট সেক্রেটারির চাকরিটা বিদঘুটে। অনেকটা ভদ্রবেশী চাকরের মতন। তোমাকে মানায় না।

—মোটেই সেরকম নয়। ও তো আমার বন্ধু, আমার সঙ্গে কলেজে পড়ত—অনেকটা সেই হিসেবেই—

—তোমার সঙ্গে কলেজে পড়ত? কোথায়, বিলেতে?
—না প্রেসিডেন্সি কলেজে।
—ও! দার্জিলিংয়ে কোথায় ছিলে? ওদের বাড়ি তো সানফ্লাওয়ার গার্ডেনস্‌-এ।
—হ্যাঁ, হ্যাঁ। সানফ্লাওয়ার গার্ডেন্‌সেই ছিলাম। চমৎকার বাড়িটা—
—বাড়িটা দেখেছি মনে হচ্ছে।
—না দেখে উপায় কী? অত বড় বাড়ি—
—সানফ্লাওয়ার গার্ডেনস্‌ তো রেসকোর্সের কাছে?
—হ্যাঁ, একদম কাছে।
—কোথায় কোথায় ঘুরলে সেবার?
—কালিম্পং গেলাম, ঘুম, তারপর, ইয়ে কার্শিয়াং—খুব বেড়িয়েছিলাম।
—লায়নস্‌ পীকে যাওনি? ওখানে তো সবাই যায় অন্তত একবার। টাইগার হিলস্‌-এ সূর্যোদয় দেখার মত, আর সান-সেট দেখতে হলে লায়নস্‌ পীকে—
—হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। লায়নস্‌ পীকে আমরা একটা রাত কাটালাম। ওখানেও ওদের একটা ছোট্ট বাড়ি আছে। শুধু সানসেট দেখা নয়, ওখানে পূর্ণিমার রাতটা এত চমৎকার—চাঁদের আলো যখন পাহাড়ে পড়ে···
ডালিয়া হাসতে আরম্ভ করল। হাসতে হাসতে বলল, দার্জিলিংয়ে চাঁদের আলো—তুমি ছাড়া আর কেউ দেখেনি। চমৎকার, না?
—সত্যি আমরা দেখেছিলাম—
ডালিয়া বলল, তোমার সঙ্গে মিশে মিশে আমিও কি-রকম চমৎকার বানিয়ে বানিয়ে কথা বলতে শিখেছি, দেখলে তো? দার্জিলিংয়ে সানফ্লাওয়ার গার্ডেনস্‌ বলে কোন জায়গা নেই। লায়নস পীক বলেও কিছু নেই। এ সব নামই আমি তোমাকে ঠকাবার জন্য বলছিলাম। আর তুমি সেখানে পূর্ণিমার চাঁদ দেখে ফেললে? তুমি ছাড়া আর কেউ দার্জিলিং-এর আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ দেখার কথা ভাবে না।
ধরা পড়ে গিয়েও অরিন্দম অপ্রস্তুত হল না। সে-ও হাসতে শুরু করল। ডালিয়া বলল, তুমি সত্যিই দার্জিলিং-এ আগে আসোনি তো? দেখো তোমার সত্যি খুব ভালো লাগবে।
অরিন্দম বলল, তোমার সঙ্গে আমি যেখানেই যেতাম, তাই-ই ভালো

লাগত। তুমি আর আমি পাশাপাশি আছি, এইটাই তো সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার!
ডালিয়া হঠাৎ ড্রাইভারকে বলল, এই রোক্‌কে। ভাইনা ঘুমাও!
অরিন্দম জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাব?
—এই ডাকবাংলোটা দ্যাখো! ছবির মতন সুন্দর না? এর নাম শুকনো ডাকবাংলো। কুচবিহারের রাজকুমারের সঙ্গে তুমি কি এখানে এসেছিলে?
স্মিত ওষ্ঠে অরিন্দম বলল, না।
—চল, তা হলে আমরা এখানে চা খাব।
দোতলা ডাকবাংলোটা আগাগোড়া কাঠের তৈরী। বাড়িখানি ইংরাজ-পছন্দ। কাছেই বেশ ঘন জঙ্গল। অরিন্দমের কবি-চিত্ত এখানে উদাত্ত হয়ে উঠল। তার অসম্ভব ভাল লাগছে। ঝুরু ঝুরু বৃষ্টি পড়ছে। সব কিছুই যেন স্বপ্নের মতন।
অরিন্দম বলল, কী চমৎকার এই জায়গাটা। দার্জিলিংয়ে গিয়ে কি হবে? এইখানেই তো থাকলে হয়!
ডালিয়া তক্ষুনি বলল, থাকবে? তা হলে ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু এখানে আমার ভয় করবে।
—ভয় করবে কেন?
—তোমার মতন কবিদের এইসব নির্জন জায়গা ভাল লাগতে পারে—কিন্তু এরকম বন জঙ্গলের মধ্যে থাকতে আমার ভয় করে।
—বাঘ এসে তোমাকে টপ করে খেয়ে ফেলবে?
—আমি বাঘের ভয় পাই না। আমার সব সময় খুব ডাকাতের ভয় করে। ফাঁকা জায়গায় থাকতে আমার ভাল লাগে না। ডাকাত এসে জিনিসপত্র সব কেড়ে নিলেও আমার আপত্তি নেই, কিন্তু যদি মারে—
—মারবে কেন? তোমার মত সুন্দর প্রাণীকে কেউ মারে?
—এই, ওকি কথাবার্তা বলার ছিরি! আমি কি প্রাণী নাকি?
অরিন্দম হাসিমুখে চেয়ে থেকে বলল, ক্ষমা চাইছি। আসলে তোমাকে বর্ণনা করার ভাষা আমি খুঁজে পাই না। আচ্ছা, এবার থেকে নতুন শব্দ আবিষ্কারের চেষ্টা করব। কিন্তু তুমি ডাকাতের ভয় করছ কেন? ডাকাত এলে আমিই তো তোমাকে বাঁচাব।
—দেখি, বীরপুরুষের চেহারাটা দেখি! সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র আছে কিছু?
—কলম আছে। *দি পেন ইজ মাইটিয়ার দ্যান দি সোর্ড!*

চা খাওয়ার পর বাংলোর চত্বরে ওরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। বৃষ্টিতে ভিজছে, তাতেও হুঁশ নেই। ডালিয়া বলল, এই বাংলোটা সম্পর্কে আমার খুব দুর্বলতা আছে। আমি প্রথম যে ছবিতে নামি, তার কিছুটা শুটিং হয়েছিল এইখানে। সাত-আট বছর আগে। তখন আমি কী ভীতু ছিলাম।

—আর এখন ?

—এখন আমি একজন দারুণ সাহসী লোকের পাশে রয়েছি।

—কি ছিল তোমার সেই প্রথম ছবির নাম ?

—পলাশ বনের নেশা। দেখোনি ? হিট করেছিল খুব।

—আমি সিনেমা-টিনেমা খুব কম দেখি। তুমি কি বললে বিশ্বাস করবে যে, তোমার সঙ্গে দেখা হবার আগে আমি তোমার নামই জানতাম না !

—তাতে আমার বয়েই গেল। আমিও তোমার নাম জানতাম না !

—কিন্তু আমি তোমাকে চিনতাম !

—নাম জানতে না, অথচ চিনতে কি করে ?

—আগের জন্ম থেকেই তোমাকে চিনি মনে হয়। ডালিয়া হাসতে হাসতে আবার বলল, তোমার সঙ্গে কথায় পারা যায় না !

শেষ পর্যন্ত শুকনো বাংলোতে থাকা হল না। ওরা আবার দার্জিলিংয়ের রাস্তা ধরল।

দার্জিলিংয়ের সবচেয়ে বড় হোটেলে ডালিয়ার জন্য একটা সুইট ভাড়া করে রাখা আছে। সেখানে পৌঁছবার পর ডালিয়া বলল, তুমি খুব লাকি, অরিন্দম ! তোমার জন্য আজ দার্জিলিংয়ে রোদ উঠেছে। এত ভাল ওয়েদার খুব কম পাওয়া যায় ! জানলা দিয়ে দ্যাখো। ভাল লাগছে না ? তুমি গম্ভীর হয়ে গেছ কেন ?

—আমার অসম্ভব ভাল লাগছে। স্বপ্নের মতন মনে হচ্ছে।

—সব স্বপ্নই কি ভালো ? আমি তো প্রায়ই ভয়ের স্বপ্ন দেখি।

—তা হোক। কিন্তু যে-সব ব্যাপারগুলো স্বপ্নের মতন—ঠিক স্বপ্ন নয়, আবার ঠিক বাস্তব বলেও মনে হয় না—সেগুলো সত্যিই বড় সুন্দর। যেমন তুমি !

আমি বাস্তব নয় ? ছুঁয়ে দেখলেই তো পারো। অরিন্দম একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ডালিয়ার দিকে। তার মুখখানা হঠাৎ একটু বিষণ্ন হয়ে এলো। ভালো করে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় তার শরীরটা একটু একটু

কাঁপছে। এতখানি পরিবর্তন হঠাৎ সহ্য করতে পারছে না বেচারা। সত্যিই সব ব্যাপারটাকে যেন বাস্তব বলে গ্রহণ করতে পারছে না সে।

—আমি চানটা করে নিই। তুমি চান করবে তো?

—হ্যাঁ। তোমার পরে।

—তোমাকে সত্যি একটু গম্ভীর দেখাচ্ছে। বাড়ির জন্য মন কেমন করছে নাকি?

—অন্য কোন কথা আমার মনেই পড়ছে না।

—শোনো, ভাল কথা। আর একটা ঘর কি ভাড়া করতে হবে? তোমার শুচিবাই নেই তো? আমার সঙ্গে এক ঘরে থাকতে পারবে তো?

—শুচিবাই থাকবে কেন?

—না, তোমার মধ্যে কি রকম একটা না-ছুঁই না-ছুঁই ভাব আছে তো! আমার পক্ষে অবশ্য এটা নতুন অভিজ্ঞতা বলে ভালই লাগছে।

—আমি না হয় বসবার জায়গায় যে সোফাগুলো রয়েছে সেখানে শোবো!

—কেন, আমার সঙ্গে এক বিছানায় শুতে পারবে না?

অরিন্দম আবার নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল ডালিয়ার দিকে। তার বুকের মধ্যে কাঁপুনিটা আরও বেড়ে যাচ্ছে। এই সব কত অবলীলাক্রমে বলে ডালিয়া। অথচ অরিন্দম কখনো এসব স্বপ্নে দেখারও সাহস করেনি।

—এই ঘরেই তো দুটো খাট রয়েছে!

—তোমার বুঝি ভয় করছে, আমাকে?

—তোমার ভয় করছে না?

—আমার! তোমাকে ভয়?

—আমি যদি হঠাৎ তোমার কাছে অনেক কিছু চাই?

—কি চাইবে?

—আমার কিন্তু খুব ছুঁতে ইচ্ছে করে তোমাকে। আঙুলটা দাও তো!

—আঙুল?

ডালিয়া খিলখিল করে হেসে উঠল। ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এই নাও! আঙুল ছুঁয়ে কি মনে হয়?

—সারা শরীরে বিদ্যুৎ খেলে যায়!

—দেখো, বেশী শক্ লাগে না যেন!

—কিন্তু, শোনো ডালিয়া, ঘুমোলে আমার নাক ডাকে—তাই কারুর সঙ্গে আমি কখনো এক ঘরে থাকতে চাই না।

— কখনো না কখনো কারুর সঙ্গে তো থাকতেই হবে।
—নাক ডাকার জন্য আমার ভীষণ লজ্জা করে। নিজে তো শুনতে পাই না —
—সারা রাত না ঘুমলে আর নাকও ডাকবে না। সারারাত ঘুমোবে না।
—কি করব?
—তুমি একটা বুদ্ধু! বুঝলে বুদ্ধুরাম! সারা রাত আমরা নাচব। আমার খুব নাচতে ইচ্ছে করছে। তুমি নাচবে আমার সঙ্গে?
—আমি যে নাচতে জানি না একদম!
—ঠিক আছে, আমি নাচব, তুমি দেখবে। নাচতে নাচতে ক্লান্ত হয়ে গেলে, তারপর গল্প করব দু'জনে। গল্প করতে করতেও যদি ক্লান্ত হয়ে যাই—তবে পাশাপাশি শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ব। কিন্তু গল্প করতে গিয়ে আমরা কখনো ক্লান্ত হব না। হব?
অরিন্দম ডালিয়ার দিকে আর তাকাতে পারছে না। তার শরীরটা যেন তার আয়ত্বে আর থাকছে না। কানের পাশে আগুনের স্পর্শ। চেতনা যেন অবশ হয়ে আসছে। তার জীবনটা হঠাৎ এমন বদলে যাওয়ায় সে ঠিক মানিয়ে নিতে পারছে না। হোটেলের রেজিস্টারে তার নাম লেখা আছে অবনী সোম। সে এক সময়ে ছিল অরিন্দম লাহিড়ী। এখন সে নিজেকেই নিজে যেন ঠিক চেনে না।
অরিন্দম বলল, আচ্ছা ডালিয়া, তুমি যে দার্জিলিং-এ এসেছ সে কথা মিঃ সোম জানেন?
— ডালিয়া বলল, হ্যাঁ। কেন?
— যদি উনি হঠাৎ এসে হাজির হন?
—তুমি লড়াই করতে পারবে না? একবার এরকম হয়েছিল—পুনাতে শুটিং করতে গিয়েছিলাম—ও হঠাৎ এসে হাজির। তখন ওর খুব সন্দেহ বাতিক ছিল। এখন আসবে না—দার্জিলিং-এ এখন রেস নেই!
অরিন্দম চুপ করে রইল। এসবই তার নতুন অভিজ্ঞতা। এই ধরনের মানুষ সে আগে কল্পনাও করেনি।
অরিন্দম মাত্র একটা কোট আর সোয়েটার এনেছে। তাও খুব সাধারণ। ডালিয়া তার জন্যে গরম জামাকাপড় কিনে দিতে চায়। অরিন্দম কঠোর-ভাবে নিষেধ করে দিয়েছে। ডালিয়ার কাছ থেকে সে কিছু নিতে চায় না। প্লেনের ভাড়া ও হোটেলের খরচ সে দিতে পারছে না বলে ভেতরে ভেতরে তার বড় লজ্জা। কিন্তু এই টাকা যোগাড় করা তার পক্ষে

সাধ্যের অতীত।
এরকম জাঁকজমকওয়ালা হোটেলে তার মতন সাধারণ পোশাকপরা মানুষের উপস্থিতি একটু বিসদৃশ, অবশ্য অরিন্দম তা গ্রাহ্য করবে না। কয়েকজন আমেরিকানও তো ময়লা জামাকাপড় পরে ঘুরছে—তাদেরবেলা তো কেউ কিছু বলে না! ডালিয়ার সঙ্গে বেড়াতে বেরুলে ডালিয়ার পাশে তার পোশাকের জন্য একটু বেমানান দেখায়—দেখাক্ ?
এখন সীজন্ নয়, তবু বেশ ভিড় দার্জিলিংয়ে। অনেকেই চিনতে পারছে ডালিয়াকে। কেউ কেউ আলাপ করতে আসছে। ডালিয়া রীতিমতন অভদ্র ব্যবহার করছে তাদের সঙ্গে। অরিন্দমকে সে বলল, আমি আর কারুর সঙ্গে কথা বলব না এখানে। এখানে শুধু তুমি আর আমি! এখন আমার পৃথিবীতে আর কিছু নেই!
ম্যাল ছাড়িয়ে ওরা হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল নিরালা রাস্তায়। মাঝে মাঝে ঘোড়ায় চড়ে কয়েকজন পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। ওরা ঘোড়া নেয়নি। ওদের হাঁটতে ভাল লাগছে।
ম্যালের লোকজনের ভিড়ে অরিন্দম একটু আড়ষ্ট হয়ে ছিল। আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে তার মনের জড়তা। পাহাড়, উপত্যকা, আকাশের বিস্তৃতি প্রভাব ফেলেছে তার মনে। সে নিজে থেকেই ডালিয়ার একটা হাত নিল নিজের হাতের মুঠোয়। তারপর বলল, ডালিয়া, তুমি আমাকে নিয়ে হঠাৎ দার্জিলিংয়ে এলে কেন? সবটাই তোমার খেলা?
—হোক না খেলা! এই খেলাটা তোমার ভাল লাগছে না?
—খুব ভাল লাগছে! সে কথা ঠিক।
—অরিন্দম, তুমি এখানে কবিতা লিখবে না?
—কবিতা লিখব কি! তোমাকে দেখে দেখেই আমার আশ মিটছে না!
—শুধু দেখার জন্যই কারুর এত আনন্দ হয়, আমি আগে জানতুম না!
—কবিরা রূপের জন্য পাগল। পৃথিবীর রূপ, মানুষের রূপ—তাদের পাগল করে দেয়। একটু আগে যে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা গেল একবার—সেই কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপ আর তোমার রূপের জাত এক।
—আমাকে নিয়ে তুমি কবিতা লিখবে?
—তোমাকে নিয়ে কবিতা লিখতে গেলে নতুন শব্দ আবিষ্কার করতে হবে। সেই শব্দই যে পাচ্ছি না। আচ্ছা, এখন থেকে অন্যরকম ভাষায় কথা বলবে?

—কি রকম ?
—তুমি একটা মিশুমিশু কুটুস সুটাম! তুমি পানটু মামটু তুতুস করবে ?
—তুমি নাপুটুপু ডিনটি সিমটি।
—পাপাপোলো তাতাতুয়া লুপুং তুমাং !
ডালিয়া হাসতে হাসতে বলল, ধ্যাৎ ! এরকম ভাবে তো লোকে বাচ্চাদের আদর করে।
—বাচ্চারা যতদিন মানুষের ভাষা শেখে না, ততদিন যা খুশি বলা যায়। মনে করো, আমরা সব ভাষা ভুলে গেছি। খেলাই যখন হচ্ছে।
—এই রে, বৃষ্টি এসে গেল ! আর তো খেলা যাবে না।
একটু আগে রোদ ছিল, হঠাৎ এমন বৃষ্টি এসে যাবে ওরা ভাবেনি। কাছাকাছি কোথাও দাঁড়াবার জায়গা নেই। ওরা হাত ধরাধরি করে দৌড়তে লাগল !
দূর থেকে তখন ওদের দেখলে মনে হবে, ওরা দুটি নিষ্পাপ আত্মা— অন্য কোন জগৎ থেকে এখানে হঠাৎ চলে এসেছে। কোন মালিন্য ওদের স্পর্শ করে না—বৃষ্টির মধ্যেও উদ্দাম খুশী ওদের সর্বাঙ্গ ছেয়ে আছে।
হোটেলের ঘরে ফিরে ডালিয়া ভিজে কাপড় ছাড়ছে, একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে আছে অরিন্দম। ডালিয়া মৃদু ধমক দিয়ে বলল, এই, হাঁ করে দেখছ কি ! অন্যদিকে ফিরে বসো—।
অরিন্দম লজ্জা পেয়ে বলল, আমি অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। খারাপ কিছু ভাবিনি।
ডালিয়া আবার হাসিতে সারা শরীর কাঁপিয়ে বলল, খারাপ ? ওঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না। এরকম নাবালক আমি দেখিনি !
অরিন্দম ততক্ষণে মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে বসেছে। ডালিয়া বলল, আমি ভাবলাম, তুমি বুঝি সেই চুম্বকটা দেখার চেষ্টা করছ !
চুম্বক কথাটা শুনে অরিন্দম হঠাৎ চমকে উঠল। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল মেঝের দিকে। তার বুকের ভেতরটা অকারণে আবার কাঁপতে শুরু করেছে।
ডালিয়া বলল, হয়ে গেছে। এবার তাকাতে পার। এই শোনো, তোমার পারমিশান নিয়ে আমি মাঝে মাঝে দু'একটা অসভ্য কথা বলতে পারি ? মাঝে মাঝে জিভে এসে যাচ্ছে।
অরিন্দম এক ধমক দিয়ে বলল, না ! ওসব চলবে না !

—আচ্ছা বাবা, বলব না! কোথা থেকে এক পুরুত ঠাকুরের পাল্লায় পড়লাম আমি।
সন্ধ্যের পর বেয়ারা একটা ছোট্ট চকচকে পেতলের বালতিতে কিছু বরফের টুকরো—আর তার মধ্যে ডোবানো একটা কালো রঙের বোতল রেখে গেল।
অরিন্দম এরকম দৃশ্য দেখেছে ইংরেজি সিনেমায়। তবু ডালিয়াকে জিজ্ঞেস করল, এটা কি?
ডালিয়া বলল, শ্যাম্পেন। তুমি শ্যাম্পেন খেয়েছ কখনো?
অরিন্দম চাল মেরে বলল, আগে অনেক খেয়েছি। এখন আর তেমন ভাল লাগে না।
ডালিয়া বলল, তোমার অনেক রাজা-মহারাজা বন্ধু ছিল, তুমি তো খাবেই! তা আজকে এই দাসীর প্রতি দয়া করে তার সঙ্গে একটু খাবে কি?
—খেতে পারি, আপত্তি নেই।
—তাহলে দয়া করে একটা বেয়ারাকে ডাকো বেল টিপে! সে এসে ছিপি খুলে দেবে।
অরিন্দম ভুরু কুঁচকে বলল, বেয়ারাকে ডাকতে হবে কেন? আমিই খুলে দিচ্ছি।
ডালিয়া মাথা নেড়ে বলল, ও কাজ করতে যেও না। ঠকে যাবে।
—কেন?
—ধরা পড়ে যাবে যে, তুমি আগে কখনো শ্যাম্পেনের বোতল খোলনি।
দুটি গেলাসে শ্যাম্পেন ঢেলে ওরা গেলাস দুটো উঁচু করল। ডালিয়া বলল, আজকের দিনের স্মৃতিতে। ঠক্ করে ঠুকল দুটি গেলাস। তার পর ঠোঁটের স্পর্শ পেল।
অরিন্দম সিগারেট ধরিয়েছিল, ডালিয়া তার হাত থেকে সেটা নিয়ে টানতে লাগল। অরিন্দম বলল, এই, এঁটো সিগারেট খাচ্ছ কেন? আর একটা ধরিয়ে দিচ্ছি!
ডালিয়া বিচিত্র ভাবে হেসে বলল, এঁটো? তাতে কিছু যায় আসে না!
সিগারেটটা ফিরিয়ে দিয়ে ডালিয়া বলল, নাচব?
অরিন্দম বলল, প্রথম যেদিন স্টুডিওতে তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাই, সেদিন তোমার একটা নাচের শুট্ ছিল। আমি দেখতে চেয়েছিলাম,

তুমি দাওনি !
— বেশ করেছি !
—তুমি বড্ড চালিয়াত।
—তুমি সেদিনের কথা অত বেশী মনে রেখেছ কেন ?
—কিছুতেই ভুলতে পারি না।
—আজ তোমার আশ মিটিয়ে দেবো। আজকের নাচ শুধু তোমার জন্য। রেডিওটা খুলে দ্যাখো তো, কোন ভাল গান আছে কিনা !
রেডিওতে তখন শুধু বক্ বক্ ! কোন সুর নেই ! ডালিয়া এমনিই নাচতে আরম্ভ করল।
সারা ঘর ঘুরে ঘুরে নাচছে ডালিয়া খুব মৃদু মন্থর ছন্দ। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন। অরিন্দমের বার বার মনে হচ্ছে, এটা কোন বাস্তব দৃশ্য নয়—মায়া, কারুর ম্যাজিক। এই ঘর, এই অপরূপা নারী, এই নৃত্যের মন্থর ছন্দ, তার এই বসে থাকা—এই সবকিছুই স্বপ্নের মতন। সে অরিন্দম নয়, সে অন্য কেউ। তার কোন অতীত নেই।
ঘুরতে ঘুরতে ডালিয়া বলল, অরিন্দম, তুমি গান জানো না ?
—আমার গলায় সুর ঠিক আসে না !
—তাতে কিছু যায় আসে না। আস্তে আস্তে ধরো, যে-কোন গান—
অরিন্দম গুনগুন করে ধরল – আজি এ আনন্দসন্ধ্যায়, সুন্দর বিকাশে...
ক্রমশ উঁচু হল অরিন্দমের গলা। খুব একটা সূক্ষ্ম সুর না থাকলেও তার গলায় বেশ জোর আছে। ডালিয়া এই আনন্দসন্ধ্যায় মূর্তিমতী সুন্দর হয়ে উঠল।
হঠাৎ থেমে গিয়ে ডালিয়া বলল, এস, তুমিও নাচবে এস !
—আমি যে একটুও জানিও না।
—তা হোক, এস—
—না, তুমি করো—খুব সুন্দর লাগছে !
ডালিয়া একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল অরিন্দমের দিকে। তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। তার ঠোঁটে অদ্ভুত ধরনের হাসি। লাল রংয়ের শাড়িতে মনে হচ্ছে, তার সমস্ত শরীরভরা আগুন।
ডালিয়া আবার বলল, এস—। আমাকে একটু জড়িয়ে ধরো। অরিন্দম, তুমি আমাকে ভালবাসবে ? খুব ভালবাসবে ? অসম্ভব ভালবাসা দিয়ে আমাকে পাগল করে দিতে পারবে ?

হাতের গেলাসটা নামিয়ে রেখে অরিন্দম উঠে দাঁড়াল। তারও রক্তে নেশা লেগেছে। ঘোর-লাগা মানুষের মত এগিয়ে গেল ডালিয়ার দিকে। ডালিয়ার হাতটা ছুঁয়েই সে থেমে গেল। খুব অবাক ভঙ্গিতে তাকাল ডালিয়ার উদগ্রীব ঠোঁট ও চোখের দিকে।
ডালিয়া আবার বলল, এসো!
অরিন্দম হাত ধরে ডালিয়াকে টেনে আনল নিজের বুকের ওপর। সেই মখমলের মতন শরীরের স্পর্শে কেঁপে উঠল তার পৃথিবী। ডালিয়ার গালে গাল ঠেকিয়ে তীব্র গলায় বলল, তুমি অসহ্য সুন্দর! তোমাকে আমি ভেঙে ফেলব, নষ্ট করে ফেলব।
পর মুহূর্তেই অরিন্দম আবার ডালিয়াকে ঠেলে সরিয়ে দূরে চলে গেল। ডালিয়া হেসে জিজ্ঞেস করল, কি, কারেণ্ট লাগল নাকি?
ডালিয়ার দিকে আর একবার হাত বাড়িয়েও হাতটা ফিরিয়ে নিল অরিন্দম। হঠাৎ তার শরীর শক্ত হয়ে গেছে। চোখ দুটি খুবই অন্যমনস্ক। পিছিয়ে গেল আস্তে আস্তে। ফিসফিস করে বলল, তুমি নাচো আমি দেখি, তোমাকে দেখতেই খুব ভালো লাগছে।
কত্থক নাচের ভঙ্গিতে মাটিতে পা ঠুকল ডালিয়া। ভোজালির মতন উরু। সরু কোমরে সবটুকুই পরিদৃশ্যমান—একছিটে চর্বি নেই সেখানে। সোনার বাটির মত দুটি বুক। ভিজে ভিজে ঠোঁট। সুন্দর এর নাম—কিন্তু এ সেই ধরনের সৌন্দর্য যা দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। দেওয়ালির আলোতে বাদলা পোকারা যে সৌন্দর্য দেখতে পায়। উদগ্রীব বাঘের মতন অরিন্দমের বসে থাকার ভঙ্গি—কিন্তু সে উঠে দাঁড়াচ্ছে না।
বিদ্যুতের মত ডালিয়া কয়েক পাক ঘুরে গেল বুকের আঁচল ফেলে সে নিজের বুকে হাত দিয়ে বলল, এসো, সেই চুম্বকটা দেখবে না?
প্রায় চিৎকার করে অরিন্দম বলল, চুপ!
—আমাকে জড়িয়ে ধরবে না?
—না।
—কেন? আমি পাপিষ্ঠা?
—ডালিয়া, আমি তোমার যোগ্য নই।
—আমিই তো তোমার দাসী! এসো প্রভু, আমাকে একটু শান্তি দাও! আর যে পারি না! এত নাচ দেখালুম, তার বদলে কিছু দেবে না?
—ডালিয়া, আমার অসম্ভব ইচ্ছে করছিল। কিন্তু হঠাৎ একটা কথা

মনে পড়ে গেল। এ-কথাটা আমি এতদিন ভুলে ছিলাম। আমার মনে হল, কি যেন একটা অসম্ভব শক্তি চুল ধরে আমাকে পেছনে টেনে নিয়ে আসছে।

—কি বলছ পাগলের মতন?

—ডালিয়া, আমি তোমাকে ভালোবাসি না।

—কে চায় তোমার ভালবাসা? এই মুহূর্তে আমি শুধু তোমাকে চাই। তুমি আমাকে চাও না!

—আমি তোমাকে ভালোবাসতে পারব না। ভালো না বেসে কি কারুর শরীর ছোঁয়া যায়?

—যায় কি না আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। এসো—

অরিন্দমের মুখখানা বিবর্ণ। শরীর কাঁপছে। নিঃস্ব মানুষের মতন গলায় বলল, ডালিয়া, আমি একটি মেয়েকে কথা দিয়েছিলাম, সেই প্রতিজ্ঞার কথা আমার মনে পড়ে গেল। সেটা আমি ভাবতে পারি না।

—তুমি হঠাৎ এত সীরিয়াস হয়ে যাচ্ছ কেন? এটা তো একটা খেলা।

—খেলা ভেঙে গেছে!

—এই সময় কি খেলা ভাঙতে হয়! তুমি খেলার নিয়ম জানো না।

—ডালিয়া, আমি দুঃখিত। তোমার এমন সুন্দর সন্ধ্যেটা হয়তো আমি নষ্ট করে দিলাম।

—মেয়েটি কে?

—এমনিই, সাধারণ একটি মেয়ে। তার নাম ঝুমা। সে আমাকে খুব ভালবাসে। আমিও তাকে সত্যিই ভালবাসি। আমার জীবনে সে প্রথম নারীর রহস্য নিয়ে এসেছে। তার কথা ভুলেছিলাম, যেই মনে পড়ে গেল—আমি কিছুতেই আর তোমাকে ছুঁতে পারলাম না।

—আমাকে ছুঁতে ঘেন্না করল?

—না না, ঘেন্না নয়। আমার নিজের কতটা কষ্ট হচ্ছে তুমি বুঝতে পারবে না! আমি যেন একটা অসম্ভব ঝড়ের মধ্যে পড়েছি!

ডালিয়া গেলাসটা তুলে এক চুমুকে শেষ করল। তারপর গেলাসটা দেয়ালের গায়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিষ্ঠুরের মতন বলল, সন্ধ্যেবেলা এসব ন্যাকামি ভালো লাগে না। তুমি সব ফুর্তি নষ্ট করে দিতে চাও? এখন একটা খেলা চলছে, মাঝপথে এই খেলা ভেঙে দেওয়া যায় না।

অরিন্দম বলল, এতক্ষণ খেলা ছিল, এখন আর খেলা নয়। আমি

একজনকে ভালোবাসি—তার সঙ্গে আমি কোন খেলা খেলতে পারব না।
ডালিয়া আলুথালু ভাবে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল অরিন্দমকে। তার আগুন-জ্বালা শরীরেরস্পর্শে এক মুহূর্তে অসহায় বোধ করল অরিন্দম। তারপর আস্তে আস্তে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিল।
ডালিয়া দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। ঠোঁটে সেই অদ্ভুত ধরনের হাসিটা এখনো লেগে আছে। আস্তে আস্তে বলল, ভালবাসা খুব ভাল। কিন্তু একজনকেই তুমি সারা জীবন ভালবাসবে—এরকম প্রতিজ্ঞা করলে কেন? সারা জীবন রাখতে পারবে?
—তা জানি না। কিন্তু এখন এ প্রতিজ্ঞা ভাঙার সামর্থ্য আমার নেই।
—তুমি এত মিথ্যে কথা বলো, আর সামান্য এই একটা কথার ওপর এত জোর দিচ্ছ কেন?
—আমি তো মিথ্যে কথা বলি না।
ডালিয়া কুলকুল করে হাসল। বলল, দ্যাখো অরিন্দম, এই ক'দিনে তোমার কাছে আমি হাজার মিথ্যে যে শুনেছি—
অরিন্দম আন্তরিক ভাবে বলল, সত্যি বিশ্বাস করো ডালিয়া, আমি মানুষের জীবন নিয়ে কোন মিথ্যে কথা বলি না। তোমার সম্পর্কেও একটাও মিথ্যে কথা বলিনি!
—অরিন্দম, তুমি কাপুরুষ। তুমি পুরুষ নামেরই যোগ্য নও। তুমি একটা—কি বলবো তোমাকে—
—আমাকে যা ইচ্ছে গালাগালি দাও!
ডালিয়ার চোখে জল এসে গেল। দুটো ফোঁটা গড়িয়ে এল গাল বেয়ে—
অরিন্দম কাতরভাবে বলল, একি, ডালিয়া, তুমি কাঁদছ! আমাকে প্লীজ ক্ষমা করো—আমার এত খারাপ লাগছে!
ডালিয়া চোখের জল মুছে আবার হাসল। বলল, ও কিছু না। আমরা সিনেমায় অভিনয় করি তো, আমরা যখন-তখন জল আনতে পারি। অরিন্দম, আমি তোমার ওপর রাগ করিনি। ঝুমা বলে ঐ মেয়েটাকে আমার হিংসে হয়—ওর জন্য কেউ ওরকম প্রতিজ্ঞা করে। কিন্তু আমার জন্য কেউ কখনো করবে না। আমি পাপিষ্ঠা। আমাকে শুধু খেলা খেলে যেতে হবে। অরিন্দম, তুমি কি এখন চলে যাবে?
—আমার চলে যাওয়াই বোধহয় ভাল।

—তুমি বেরিয়ে যাও! এক্ষুনি বিদেয় হও। তোমায়—আমার চোখের সামনে আর দেখতে চাই না।

—ডালিয়া, আমাকে চলে যেতেই হবে। এখনো মনে হচ্ছে সব ব্যাপারটাই স্বপ্ন। কিন্তু তুমি শেষ মুহূর্তটায় আমাকে এমন রাগ করে বিদায় দিও না।

ডালিয়া পায়ের ধাক্কায় মদের বোতলটা দূরে ঠেলে দিয়ে বলল, আমি জীবনে আর কখনো তোমাকে ক্ষমা করতে পারব? কোনোদিন না! তুমি কোনোদিন আর আমার সামনে মুখ দেখাতে এসো না!

—আচ্ছা, আর কোনোদিন আসব না। আমারই ভুল।

—না, তোমার ভুল নয়, আমারই ভুল। তুমি তো মজা লুটতে এসেছিলে। আমিই ভুল করেছি। আমাকে কেউ ভালোবাসবে না—কোনোদিন না।

অরিন্দম আর কোন কথা বলল না। ঘাড় হেঁট করে বসে বাক্স গুছোতে লাগল। তাকে চলে যেতেই হবে। ডালিয়ার এত মোহময়ী রূপ সত্ত্বেও চোখে ভাসছে ঝুমার মুখখানা। ঝুমা যেন ঠিক তার সামনে বসে আছে, অভিমানে টসটস করছে তার মুখ।

অরিন্দম টের পেল ডালিয়া তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তারপর এক ধাক্কায় সে বাক্সটা সরিয়ে দিয়ে বলল, তুমি ওঠো—সরে যাও!

অরিন্দম অসহায়ভাবে বলল, ডালিয়া, তুমি যতই রাগ করো—আমাকে চলে যেতেই হবে। তুমি আমাকে আটকে রাখতে পারবে না।

—আমি তোমার বাক্স গুছিয়ে দিচ্ছি।

—তোমাকে কষ্ট করতে হবে না।

—কষ্ট? কষ্টের কথা তুমি কি বোঝো? কবি-টবিরা কিছু বোঝে না।

—আমি সত্যিই কিছু বুঝি না। শুধু স্বপ্ন দেখতে পারি।

ডালিয়া নিজে এবার বসে পড়ল অরিন্দমের পাশে। অরিন্দমের হাত ধরে বলল, মন খারাপ করে যেও না। আমি তোমার ওপর রাগ করিনি। ওরকম কথা শুনলে কি রাগ করা যায়? শুধু ঝুমাকে বোলো, একজন তাকে খুব হিংসে করে!

চোখের জল তখনও শুকোয়নি, ডালিয়া আর একবার খুব সুন্দর করে হাসল।